# পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস

– ইমরান ইউসুফ

জাভেদ আমার বন্ধু। ওর বোন গুড়িয়ার বিয়ে। আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় আট বছরের। তাই এবার ওর নিমন্ত্রণ কবুল করতেই হলো।

প্রথমে গেলাম কলকাতার বহরামপুরে। ওখানে জাভেদের এক চাচা থাকেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে তিন দিন ওখানে ছিলাম।

এরপর গুড়িয়ার বিয়ে উপলক্ষে ওর চাচার পরিবার-পরিজনসহ যাত্রা করলাম হাওড়া থেকে *পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস* যোগে। প্রায় ঊনিশ ঘণ্টার যাত্রার পর পৌছালাম উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে বড় রেল জাংশন মাও নাথ ভঞ্জনে। এই দীর্ঘ যাত্রা পথে আমাকে এতোই অভিভূত করেছিল যে তা আজীবন আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তাজা থাকবে।

এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল সে হলো অনু (গুড়িয়ার বান্ধবী)। কলকাতার মেয়ে, আমাদের সহযাত্রী হয়ে মাউ যাচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনের চরিত্র অনুর জানা। কোন স্টেশন কিসের জন্য বিখ্যাত, কি কি মুখরোচক খাবার পাওয়া যায় সব কিছু ওর নখদপর্ণে।

মাও পৌছে আমাদের আবারও গাড়িতে চড়তে হলো। প্রায় দুই ঘণ্টা পর কারাহা পৌছালাম। আগে থেকে জানতাম যে, জাভেদের গ্রাম রক্ষণশীল। তবে এতোটা যে বুঝতে পারিনি।

জাবেদের গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই কর্মজীবী। মানে ওখানকার সবাই তাত শিল্পের সঙ্গে জড়িত। মহিলারা খুব পর্দার আড়ালে থাকে। সারা দিন কাজ করে যাচ্ছে আর পুরুষরা বাইরে ঘরে অন্য মেশিনে কাপড় বোনার কাজে মশগুল।

আমি পড়লাম ফাপরে। সারা দিনময় আড্ডা দেয়ার মতো লোক খুজে পাই না। অগত্যা অনুকে সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে পার করে দিলাম তিন দিন।

এর মধ্যে গুড়িয়ার বিয়ে নিয়ে জাভেদ মশগুল হয়ে গেল।

আমি আর অনু এক সঙ্গে থাকতে থাকতে খুবই ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম।

গুড়িয়ার বিয়ের পরের দিন বাংলাদেশ থেকে বাবা ফোন করে বললেন, তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।

এদিকে আমি ও অনু খুবই কাছাকাছি চলে এসেছি। শুধু বলা বাকি ছিল যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি এই বাক্যটা।

বিকেলে জাভেদকে বিষয়টা বললাম। আরো জানালাম যে, আমার বিয়ের ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

জাভেদ পরামর্শ দিল, এই অবেলায় ভালোবাসার কথা জানিয়ে লাভ নেই। এতে করে দুজনের কষ্ট বাড়বে, কমবে না।

দেখলাম ঠিকই বলেছে। তাই মনের ভেতরে লালিত ভালোবাসা মনের মণিকোঠায় জমিয়ে রাখাটাই শ্রেয় মনে করলাম।

ফিরে আসবো। এবার আমার সহযাত্রী হিসেবে আছে শুধু অনু, বাকি সবাই রয়ে গিয়েছে বিয়ের পরের অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করার জন্য।

মাউ জাংশনে এসে আমাকে অনু প্রশ্ন করলো, তুমি তো বেশ কিছুদিন থাকার জন্য এসেছিলে। তবে কেন এতো তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছো?

বললাম, বাবা তলব করেছেন, যেতে হবে।

অনুই টিকেট করতে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো যে, টিকেট পাওয়া যায়নি।

কি করবো তখন!

অনু বললো, চলো আমরা লক্ষ্মৌ চলে যাই। সেখান থেকে হয়তো কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বললাম, ঠিক আছে চলো।

দীর্ঘ পাচ ঘণ্টা বাস ভ্রমণের পর আমরা লক্ষ্মৌ এসে পৌছালাম।

তারপর বললো, চলো যখন এতো কাছে এসেছি তখন ভুলভুল্লায়া দেখে যাই।

আমারো সুপ্ত ইচ্ছা ছিল। তবে আমাদের সঙ্গে এতোগুলো মালপত্র আছে, সেগুলো নিয়ে কেমন করে যাই!

সমাধান দিল অনু। বললো, আমরা মাঝারী গোছের কোনো হোটেলে উঠে প্রথমে ফ্রেশ হয়ে নেবো, তারপর ওখানে মালপত্র রেখে ভুলভুল্লায়া যাবো।

সবার আগে বললো, তুমি তোমার পাসপোর্ট সাবধানে রাখো, আমি যা বলবো তেমন কাজ করবে।

আমরা মাওয়াড়ি গিয়ে একটি হোটেলে উঠলাম।

আমাদের পরিচয় দিল যে, আমরা স্বামী–স্ত্রী। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকলো।

হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের পরিচয়টা যদি যথাযথ দিলে ভালো হতো না!

বললো, সমস্যা আছে বলে এমন করতে হলো।

মনটা কেমন কেমন করছে। কিসের যেন একটা কাটা বিধে আছে।

যাক, সব অস্বস্তি নিয়ে ভুলভুল্লায়া দেখে ফিরে আসার পথে রাত সাড়ে দশটার *পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস*–এর লক্ষ্মৌ টু কলকাতার টিকেট করলো। এরপর সারা দিনময় রিকশা করে গোটা শহর ঘুরে দেখলাম। তবে মনটা কেমন যেন ভার হয়ে রইলো।

এটা অনুর চোখে ঠেকেছে। বার বার আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো, কেন আমি মনমরা হয়ে আছি?

কিছুই বললাম না ওকে। যদিও এক সময় মনে হয়েছিল যে, অনুকে মনের সব কথা বলে মনকে হালকা করে নিই। পাছে অনুর প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে সেটা মনে করে বলা হয়নি।

রাত সাড়ে দশটায় স্টেশনে এসে আমাদের জন্য নির্ধারিত বগিতে এসে বসলাম। দেখলাম সম্পূর্ণ বগিটা আমাদের জন্য। বললাম, অনু, এর প্রয়োজন ছিল না।

একটা ঝামটা দিয়ে আমাকে বললো, তুমি কি বুঝবে প্রয়োজনীয়তা কিংবা অপ্রয়োজনীয়তা। দীর্ঘ একুশ ঘণ্টাটা তোমার সঙ্গে একা থাকবো বলেই এ রিজার্ভেশন করেছি।

আমাদের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ঠিক সময়ে যাত্রা আরম্ভ করলো। প্রায় ঘণ্টা খানেক আমাদের মাঝে কোনো কথা হলো না। দুজনেই চুপচাপ বসে আছি।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে অনু জিজ্ঞাসা করলো, ইমরান, তোমার বিয়ে কি সত্যিই ঠিক হয়ে গিয়েছে?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাকে কে বলেছে?

বললো, তুমি যখন কলকাতা থেকে আসছিলে সে সময় কথা প্রসঙ্গে বলেছিলে যে, তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখান থেকে গিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।

হ্যা, বাবা সেই জন্য ফোন করে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে একদৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

বললাম, এমন করে কি দেখছো?

বললো, তোমাকে।

আমাকে এমন করে দেখার কি আছে?

আর কোনোদিন হয়তো তোমাকে নাও দেখতে পারি। তাই আজকের এই রাতে তোমাকে শুধু দেখবো আর দেখবো।

বললাম, তোমার–আমার মাঝে এমন কোনো গভীর সম্পর্ক নেই যে তার জন্য আমাদেরকে একজনকে অন্যজনের কথা মনে রাখতে হবে।

তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?

হ্যা, তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এ কয়দিন তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে কবে যে তোমাকে মনের মণিকোঠায় স্থান করে দিয়েছি সেটা আমিও বলতে পারবো না। তবে আমাদের মিলন সম্ভব নয়। কারণ এখানে দেশ, জাতি, ধর্ম–বর্ণ মিলে অনেক কিছুরই অমিল আমাদের মাঝে। তাহলে কিসের জন্য নিজের ভালোবাসার কথা জাহির করে নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত দেয়াল রচনার ফায়দা কি বলো?

তুমি কেন জাভেদকে বলতে গেলে তোমার ভালোবাসার কথা? সে আমাকে বলে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনু থেকে ফোন নিয়ে জাভেদকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে যাবো যে, সে কেন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, আর তখনি ঘটলো আসল বিপত্তি।

অনু আমার কাছ থেকে ফোন কেড়ে নেয়ার জন্য টানাহ্যাচড়া করছে।

আমিও দিচ্ছি না ফোন। এমন করতে করতে এক সময় নিজের বাধনটা শিথিল করতেই সে আমার বুকের ওপর উঠে এলো।

ফলে আমরা দুজন দুজনাতে মিশে একাবার হয়ে গেলাম। আমরা দুজন দুজনার হয়ে গেলাম, দুজনে হারিয়ে গেলাম অন্য ভুবনে যেখানে শুধু সুখ আর সুখ।

কতো সময় পার হয়ে গেল সেটা আমরাও বলতে পারবো না। হঠাৎ ট্রেন দাড়িয়ে গেল। আমরা সংবিৎ ফিরে ফেলাম। বুঝলাম যে আউট সিগনালের জন্য ট্রেন দাড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন আবার চলতে লাগলো। তখন সারা আকাশ আলোকিত করে প্রকাণ্ড এক চাদ উঠেছে। আমরা বার বার সেই আলোকিত আলোয় দুই দিগন্তে দুই বাসিন্দা মনের সমস্ত কালিমা এড়িয়ে পবিত্র থেকে পবিত্রময় হয়ে উঠলাম। তখন আমাদের একমাত্র মূলধন ছিল ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা।

আমরা সেই রাতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসে আমাদের ভালোবাসার যে বীজ বুনেছি সেটা দুজনের মাঝে আজো বিদ্যমান। আমরা দুজনেই অনেক চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে, সীমানা ভেঙে, ধর্মের দেয়াল টপকে আজো একে অন্যকে ভালোবাসি।

আজ আমাদের ঘর আলোকিত করে আছে আমার দুই বছরের ছেলে যার নাম রেখেছি সেই ট্রেন ভ্রমণের স্মৃতিকে, আমাদের ভালোবাসার ক্ষণকে অম্লান রাখার জন্য পূর্বাঞ্চল।

মাঝে মধ্যে অনু ওকে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস বলে ডাকে।

*জেদ্দা থেকে*

# বেদনা ও আনন্দ

### - আবদুল আলীম বিন নুরউদ্দিন

ট্রেনে করে ভ্রমণ বা আত্মীয় বাড়িতে যাওয়ার মতো তেমন সময়, সুযোগ কোনোদিনই হয়ে উঠেতো না যদি না বন্ধু সানাউল্লাহ উদ্যোগ নিতো। তার উদ্যোগেই অনেক যায়গায় গিয়েছি। আর বেশির ভাগ ভ্রমণ যান ছিল ট্রেন। তাতে করে নিজের ঝুলিতে অনেক ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। আছে অনেক আনন্দ ও বেদনার স্মৃতি এবং মর্মাহত হবার মতো ঘটনা।

এর মধ্যে থেকেই এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনার কথা আজ বড় বেশি মনে পড়ছে।

২০০২ সাল হবে। আমরা কোটচাদপুর থেকে *কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস* ট্রেনে টিকেট কেটেছি। যাবো ঈশ্বরদী বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে, সঙ্গে বন্ধুর পরিবার। তবে আমাদের শেষ গন্তব্য যমুনা সেতু।

ট্রেনের সময় আটটা চল্লিশ মিনিট।

সময় মতো ট্রেন এলো না। সাড়ে নয়টার সময় ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাড়ালো।

যে যার মতো ট্রেনে উঠে গেলাম। তারপর সিট নাম্বার দেখে বসার পর স্বস্তি পেলাম। ততোক্ষণে ট্রেন তার গতিতে চলতে শুরু করেছে।

আমরা আমাদের মতো বসে আছি আর ট্রেন প্রতিটা স্টেশনে আসার আগে মাইকে ঘোষণা দিয়ে যাত্রীদের নামার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছে। এবং এর মাঝে গান বাজছে।

সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সেদিন কুমার শানুর ইনডিয়ান বাংলা গান। এমনিতেই কুমার শানুর গান আমার পছন্দ। তার উপর এই ট্রেন জার্নিতে সে এক অন্য রকম অনুভূতি সারা দেহ–মনে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ট্রেন চলছে। এই ট্রেনে ঈশ্বরদী আসতে হলে পাকশি পদ্মা নদী পাড়ি দিতে হয় আর এই পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত বৃটিশ আমলের হার্ডিং বৃজ।

আমরা ঈশ্বরদী নেমে সেদিন থাকলাম। পরদিন আমাদের গন্তব্য স্বপ্নের যমুনা সেতু। দর্শনার্থী আমরা দুজন, আমি আর আমার বন্ধু।

আমরা ঈশ্বরদী স্টেশনে এলাম সকাল সাড়ে আটায়। আর নয়টায় আমাদের ট্রেন। তখন এই একটা মাত্র ট্রেন যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ের স্টেশন পর্যন্ত যেতো। কারণ তখনো ঢাকা–খুলনা সরাসরি লাইন বসানো হয়নি।

আমরা টিকেট নিয়ে ট্রেনে উঠলাম। এতে কোনো সিট নাম্বার নেই। সে কারণে ভালো সিট দেখে বসে পড়লাম।

ট্রেন চলছে তার আপন গতিতে ভেপু বাজিয়ে। আর আমি কম্পার্টমেন্টের জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি মুগ্ধ হয়ে। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছি, সামনে একটা স্টপেজ, তার আগে একটা লোহার বৃজ যার নাম *বড়াল বৃজ*। ট্রেনটি বৃজের ওপর ওঠার দুইশ গজ আগে থেকে একটানা হর্ন দিচ্ছে। এতো হর্ন দিচ্ছে কেন দেখার জন্য এক পাশ থেকে অন্য পাশে মাথা বের করে দিয়েছি। এমন সময় দেখলাম বৃজের শুরুর মাথায় ট্রেনলাইনের পাশে একটা যুবক ছেলে বসে আছে। ট্রেনের টানা হর্ন শুনে একটু সরে বসলো।

আমার নজর তখনো বাইরে।

ট্রেনটি বৃজ থেকে মাত্র পাচ গজ দূরে। এমন সময় ছেলেটি দ্রুত এগিয়ে এসে লাইনের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। আর তখনই ট্রেন তার মাথা ও দেহ আলাদা করে দিয়ে চলে গেল।

আমার চোখের সামনে ঘটলো ঘটনাটা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম এই স্বেচ্ছায় করুণ মৃত্যু দেখে। আমার সারা দেহ–মন ভয়ে আর ব্যথায় ভরে উঠলো।

এক সময় আমাদের ট্রেন গিয়ে পৌছালো যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ে ছয়দাবাদ স্টেশনে। তখন আকাশে বেলা শেষ, যাত্রী প্রায় সব নেমে গিয়েছে। আমরা হাতেগোনা কিছু যাত্রী তখনো আছি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ে যাবার জন্য ট্রেন বৃজের ওপর ওঠার আগেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মাঝে ট্রেনটি সেতুর ওপর ধীর গতিতে চলছে। যমুনার বিশালতা আর বৃষ্টির ধারা যেন মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

আমাদের ট্রেন সেতু পার হতে সময় নিল আট মিনিট। তখনো সামান্য বৃষ্টি পড়ছে।

এ ট্রেনই আবার বেলা তিনটায় ফেরত যাবে ঈশ্বরদী। তাই এ ট্রেনেই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ট্রেন থেকে সাড়ে বারোটার সময় নেমে তিনটার আগ পর্যন্ত যমুনার পাড়ে ও আশপাশে বেড়ালাম। তাতে মনটা একটু ভালো হলো।

তিনটার সময় এসে আবার ট্রেনে ফেরত আসার জন্য উঠে বসলাম।

ট্রেনে উঠে আবার সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ট্রেনে আমরা হাতেগোনা কয়টি যাত্রী মাত্র। তাই আমি আর আমার বন্ধুটি ট্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এক সময় একটা খালি কম্পার্টমেন্টে এসে দুই বন্ধু মিলে বসলাম। আমাদের মধ্যে কোনো কথা নেই। হঠাৎ খেয়াল করলাম ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। আশপাশে তাকাতে দেখি এক জোড়া কপোত-কপোতি একে অন্যের ঠোটে ঠোট রেখে সুখ আহরণে ব্যস্ত।

উঠে গিয়ে বাধা দিতে চাইলে বন্ধুটি বললো, ওদেরকে ওদের কাজ করতে দাও।

এতে করে আর এগোলাম না। কিন্তু তারা স্থান, পাত্র, কাল ভুলে খালি কম্পার্টমেন্ট পেয়ে নিজেদের আদিম ইচ্ছা পূরণে ব্যস্ত। আমরা যে দুটি মানুষ সেখানে উপস্থিত আছি তাও তারা খেয়াল করলো না।

ধীরে ধীরে তারা সুখের রাজ্যে হারিয়ে যাবার জন্য অর্ধনগ্ন হয়ে পড়লো। তারা মনে হয় তখন চরম আনন্দ পাবার আশায় বিভোর হয়ে উঠেছে।

সেই চরম কিছু দেখার আগেই সেখান থেকে ফিরে অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে এলাম।

আসার সময় যমুনা সেতুর ওপর দিয়ে যখন ট্রেন চলছিল তখন নদীর দুই ধারের বিশালতা দেখছি আর ভাবছি এবং মুগ্ধ হচ্ছি। এক সময় আমরা চলে এলাম সেই বড়াল বৃজে যেখানে একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছিল।

দেখলাম সে লাশ এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি, এমনকি থানা-পুলিশও না। এ ট্রেনটিই সেই লাশ তুলে ঈশ্বরদীতে নিয়ে এলো।

*মহেশপুর, ঝিনাইদহ থেকে*

# ফেরিতে ট্রেন

**- মঈনুল আহসান**

ট্রেনে ছুটছি কোপেনহেগেনের উদ্দেশ্যে।

অতি আধুনিক ট্রেন। কার্পেটে মোড়া মেঝে। ঝকঝকে ইনটিরিয়র, যাত্রী সাধারণের আরামের নিশ্চয়তায় অনেকটা ফাইভ স্টার হোটেলের অদলে সাজানো যেন এক স্বপ্নপুরী। দেয়াল জুড়ে সুবিশাল ফটোক্রোমেটিক, সাউন্ড প্রুফ গ্লাসের ফিক্সড উইন্ডো। জানালার ধারে সুন্দর ডিজাইনের দৃষ্টিনন্দন কার্টেন, ইচ্ছা হলে টেনে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেতে পারে বহিঃদৃশ্য দেখা থেকে।

আমরা অবশ্য দৃশ্যই দেখছিলাম। খুব অবাক হয়েই দেখছিলাম দিগন্ত বিস্তৃত কচি কলাপাতা রঙের সমারোহ। অথচ সপ্তাহ তিনেক আগে মার্চের শেষে যখন এখানে এসেছি তখন পুরো ডেনমার্ক ছিল পাতাহীন, বিবর্ণ, ন্যাড়া, দৃষ্টিকটু গাছের কংকালে ভর্তি। সেটা ছিল শীতের শেষ।

দিন দশেক হলো সূচনা হয়েছে বসন্তের। শুরু হয়েছে ব্রড বা লং ডেলাইট (Day Light) সময়। তাতেই হেসে উঠেছে প্রকৃতি। ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেছে পুরো ডেনমার্কের চেহারা। রুক্ষতা ঢাকা পড়েছে সজীব-সবুজ লতাগুল্মের আড়ালে। যেন বার্ধক্য মাড়িয়ে জেগে উঠেছে যৌবন নতুন উচ্ছ্বাসে।

এখানেই প্রকৃতি আর প্রাণীর পার্থক্য। প্রাণীর জন্য কাল হলো ওয়ানওয়ে ট্রাফিক, ফেলে আসা দিনে আর ফেরা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি ফিরে পায় তার হারানো রূপ ঋতু বৈচিত্রের কারণে।

তারপরও ডেনিশ প্রকৃতির এই দ্রুত পরিবর্তনটা ছিল চোখে পড়ার মতো। এতো দ্রুত যে দৃষ্টিসীমার দিগন্ত বদলাতে পারে তা চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। বইতে পড়েছিলাম উদ্ভিদ জগতের ওপর লং ডেলাইট-এর ম্যাজিকের কথা। এখন চোখে দেখে মনে হলো বিদ্যা পাঠ সার্থক।

সেই দ্রুত অপসৃয়মাণ প্রকৃতি আমাদের আপ্লুত করলেও দেশি ট্রেনের অতি চেনা সেই *কু-ঝিক-ঝিক* ছন্দটা মিস করছিলাম খুব। এ জন্যই বোধহয় ভাববাদীরা দুঃখ করে বলেন প্রযুক্তির কাছে বেগই মুখ্য, আবেগ মূল্যহীন।

তারপরও উপভোগ্য ছিল সেই ছুটে চলা। মাটির উপরে উল্কা গতিতেও যে মসৃণভাবে ছোটা যায় তা ডেনমার্কের ওই ট্রেনে চড়ার আগে আমার জানা ছিল না।

সকালে যাত্রার শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দুপুরের আগেই আমরা পৌছে যাবো নর্থ সি-র তীরে। তারপর ফেরিতে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে আবার শুরু হবে ট্রেন জার্নি।

এক ফাকে সময় দেখতে গিয়ে মনে হলো সাগর তীর বুঝি কাছাকাছি। অনুমান ঠিকই ছিল। অনুভব করলাম আমাদের ছোটার গতি কমে আসছে। ধীরে হতে হতে থেমে গেল ট্রেন। এসে গেছি ফেরি ঘাটে।

একটু দুঃখিতই হলাম যেন এতো তাড়াতাড়ি কেটে গেল স্বপ্নের মতো সময়টা! মাত্র স্থির হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু সুখ যেন আর কপালে সইলো না। একেই বলে সুখের সময় ক্ষণস্থায়ী।

যাহোক, ক্ষণিকের সুখটাকেই বড় পাওয়া মনে করে খুশি মনে ব্যাগ গুছিয়ে অপেক্ষা করছি ফেরিতে যাওয়ার ঘোষণার।

দেখলাম চারপাশে আরো অনেক ট্রেন অপেক্ষমাণ। এতো ট্রেন দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলাম, না জানি কতো ভিড় হবে ফেরিতে। আমার সহযাত্রী অন্য তিনজন ততোক্ষণে মুণ্ডুপাত শুরু করেছে আমাদের হোস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের, কি দরকার ছিল এই ট্রপের! ছুটির কয়টা দিন একটু জিরাবো, ব্যাটারা তাও হতে দিল না। এই সাতসকালে ট্রেন ধরো, ফেরি ধরো, আর ছোটো শুধু ছোটো।

এদিকে যতো দ্রুত ছুটে এলাম ততো দ্রুত ফেরিতে ওঠার ঘোষণা হচ্ছে না দেখে অবাক হচ্ছিলাম। জাতীয় স্বভাব মতো চারজনে মিলে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়লাম না। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে আবার নড়ে উঠলো ট্রেন। আমরা হতবাক! আরে, কই যায় ট্রেন?

ভাবলাম যাত্রীদের সুবিধার্থে বোধহয় ফেরির কাছে গিয়ে আমাদের নামাবে। হঠাৎ আধার হয়ে এলো চারদিকে, ট্রেন যেন ঢুকছে সুড়ঙ্গ পথে। বিস্ফারিত চোখে চার বাঙালি তাকিয়ে দেখছি তেলেসমাতি। কিন্তু সুড়ঙ্গ কোথায়? এ যে ফেরির পাটাতন। গোটা ট্রেন উঠে এসেছে ফেরিতে? উত্তেজনার চোটে চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের মুখগুলোও হা হয়ে গেছে অনেকটা। চারজন জানালায় হুমড়ি খেয়ে বোঝার চেষ্টা করছি, আসলে হচ্ছেটা কি?

অবশেষে থামলো ট্রেন। শোনা গেল প্রতীক্ষিত ঘোষণা। বলা হলো, আমরা যাত্রীরা এখন ফেরির দুই তিন চার তলায় গিয়ে প্রয়োজন মতো কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাঘুরি করতে পারি।

একটু যেন কাটলো আমাদের বিস্ময়ের ঘোর। চারজনে প্রায় একই সঙ্গে ছাড়লাম উদ্বেগ মুক্তির দীর্ঘশ্বাস। সেই সঙ্গে বর্ণনায় রূপ নিল আমাদের বিস্ময়। চার বাঙালি একত্রে কলকলিয়ে উঠলাম। কিভাবে সম্ভব? পুরো ট্রেন উঠে গেল ফেরিতে? জীবনে কোথাও শুনিনি যে, ফেরিতে ট্রেনও পার হয়, এমনকি কোনো ভ্রমণ কাহিনীতেও পড়িনি ইত্যাদি।

বের হলাম ট্রেন থেকে। দেখি মোট চারটি আস্ত ট্রেন দাড়িয়ে আছে ফেরির ডেকে পাতা রেল ট্র্যাকের ওপরে। ছয় সাত বগিতে ট্রেনগুলোকে ফেরিতে আটানোর জন্য লাইনগুলোকে বেশ কায়দা করে বাকাভাবে পাতা হয়েছে ফেরির ডেকে। মুগ্ধ আমরা ডেনিশ ফেরি টেকনলজির তারিফ করতে করতে মুখে প্রায় ফেনা তুলে ফেললাম।

এদিকে যাত্রীরা ততোক্ষণে হাত পা ঝেড়ে হাটা শুরু করেছে লিফটের দিকে। গন্তব্য উপরের তলা। এক ঘণ্টার ফেরি জার্নি। অনেকটা সময়। সাগরের নির্মল বাতাসে প্রাণ মন জুড়াবে নিশ্চয়। তাই আর বোকা হয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ট্রেন দেখা ছেড়ে আমরাও পা বাড়ালাম উপরের পথে নতুন কোনো বিস্ময়ের সন্ধানে।

*লস এঞ্জেলেস, ইউএসএ থেকে*
mainulah@usc.edu

# জীবনের গতি ঘোরানো

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হতো। শুধু একটি ট্রেন ভ্রমণ আমার জীবনটাকে তার সঙ্গে বেধে দিল বা বলতে পারেন তাকে না জানিয়েই তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

প্রথম দেখার পর তাকে আমার একটুও ভালো লাগেনি। তারপর একদিন সে আমার মামাকে রক্ত দিতে ঢাকায় যাচ্ছিল। আমি, আমার আরেক আপন মামাও তার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই যাওয়াটাই আমার শেষ ট্রেন ভ্রমণ। কেননা ট্রেনে চড়তে হলেই যে তার কথা মনে পড়ে। তখন আর ট্রেনের কাছে আমার থাকা সম্ভব হয় না।

ট্রেনে সেদিন তার প্রত্যেকটি কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি। জানি না কেন তার সাধারণ কথাগুলোও আমার কাছে এতো অপূর্ব মনে হয়েছে। সারা রাত ট্রেনে তার পাশে বসে জেগেছিলাম। যখন পুরো ট্রেনের মানুষ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে, সে অনবরত বলছে আর আমি শুনছি। তার থেকে নয় বছরের ছোট হওয়াতে কেউ কিছু ভাবেনি। তখনই মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে দিইনি।

ট্রেনের সব মানুষ ঘুমানো সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে একটুও খারাপ আচরণ করেনি। আমার কাছ থেকে বেশ দূরত্ব নিয়েই বসেছিল। আমাকে একটুও ছোয়নি। শীতের রাত হওয়াতে এবং আমার ঠাণ্ডার সমস্যা থাকাতে শীতে আমার অবস্থা যখন খুবই সিরিয়াস তখন সে তার গায়ের জ্যাকেট আমাকে খুলে দিল। কৈশোরের প্রথম ধাপে কারো কাছে এতো সহানুভূতি পাইনি বলে তাকে কেন জানি খুবই ভালোবেসে ফেললাম।

তারপর সেই ট্রেন জার্নির পর আর তার সঙ্গে তেমন দেখা বা কথা হয়নি। কিন্তু কেন তাকে এতো ভালোবাসলাম সে এখন আমার আপন খালাকে পছন্দ করে। আরো অনেক মেয়েদের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব আছে। এখন মাঝে মধ্যে আমার খালার জন্য ফোনে তার সঙ্গে কথা বলি। খুবই তীক্ষ্ম কথা বলি যাতে সে আমার দুর্বলতা না বোঝে, যাতে আমার খালা সুখী হন।

যার কথা লিখছি সে ছিল খুবই ভালো ও বিশ্রী। কিন্তু কেন যে তাকে এতো ভালোবাসলাম! তার জন্য পড়তে বসলেও মুখে পড়া আসতো না। এমন কোনোদিন নেই যে, তার কথা মনে পড়েনি! গত আট বছরে প্রতিটি দিনে তার কথা মনে পড়েছে।

জীবন তো এভাবেই বয়ে চলে। কিন্তু এখনো আমার কোনো ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। শুধু তাকে ছাড়া কাউকে ভাবতে পারি না। আমার প্রেম পবিত্র। তার শরীরের প্রতি কোনো আকর্ষণ আমার ছিল না।

এমনকি যে কয়দিন তাকে দেখেছি তার দিকে একটিবারও চোখ মেলে তাকাতে পারিনি। যখন প্রেম কি তা বুঝতাম না তখনই বুঝতাম তার জন্য আমার জীবনও দিতে পারি। এটা প্রমাণিত হলো যখন তার দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেল। তখন সবার অগোচরে ডাক্তারের মাধ্যমে আমার একটি কিডনি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন যে কয়দিন ডাক্তারের কাছে ছিলাম, বাড়িতে বলে এসেছিলাম বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি, কয়েকদিন থাকবো। কিন্তু কেউ জানতে পারলো না যে, আমিই তাকে কিডনি দিয়েছি।

জানতাম সে অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ছলনা করে। সে বংশ মর্যাদা ও শিক্ষাগত দিক থেকে মোটেও আমার সমকক্ষ নয়। তারপরও আপন জীবন অপেক্ষা তাকেই বেশি ভালোবাসি। তাকে ছাড়া আমার বাচা সম্ভব। কিন্তু অন্য কাউকে নিয়ে নয়।

পলাশ, তুমি কি কোনোদিন জানবে আমি তোমাকে আপন প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালোবাসি? আমৃত্যু তেমনই বেসে যাবো। কখনো বুঝতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আজীবন তোমার দুঃখগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে তা দূর করে তোমার সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবো। হয়তো তুমি কখনো জানবে না। আমি জানি না, তুমি যায়যায়দিন পড়ো কি না? কিংবা পড়লেও বুঝবে না বলে আমার বিশ্বাস।

জানি, কখনোই তোমাকে ভালোবাসি কথাটা বলতে পারবো না। তবুও তুমি যে শুধুই আমার। এই লেখাটা যখন পাঠক পড়বেন তখন সুদূর মাইল দূরে লন্ডনে থাকবো পড়শোনার উদ্দেশ্যে।

লেখাটায় উল্টাপাল্টা সব কথা লিখেছি। ছাপা না হলেও মনে তো শান্তি পাবো এই বলে যে, মনের কথাগুলো কেউ তো জানলো, কষ্টটা কিছু কমে গেল এই ভেবে।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# অকৃতজ্ঞ

**- জোবায়ের**

আমি গাজীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা বলে ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য তেমন হয়নি। অনেকে ভাবছেন ট্রেনে চড়াটাকে সৌভাগ্য বললাম কেন? কারণ ট্রেনের বিকট শব্দ আমাকে বিরক্ত করে না, বরং তা উপভোগ করি মিউজিকের মতো। এছাড়া আমার কাছে টেনে ভ্রমণ সবচেয়ে নিরাপদ ও রোমান্টিকও বটে।

এ যাবৎ আমি দুবার ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। আজ আমার প্রিয় যাযাদি পাঠকদের জন্য দ্বিতীয়টি বলছি।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাবো। তাই ট্রেনের টিকেট নিলাম।

যথাসময়ে জয়দেবপুর স্টেশনে এসে আমার বগিটি খুজে বের করলাম। এটি নিতান্তই ছোট। কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি ভরে গেল। এখানে আরো একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো আমার।

আমাদের সিটটি ছিল পাচ আসন বিশিষ্ট। এখানেই বসলাম চেনা-অচেনা, সমবয়সী ও অসমবয়সী সহযাত্রীদের সঙ্গে।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো।

যেহেতু ট্রেনে চড়তে ভালোবাসি, তাই সিটে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলাম না। তাছাড়া ট্রেনে আমি ছাড়াও অনেক অ্যাপ্লিক্যান্ট। সকলেই হেটে আসছে। যাচ্ছে ট্রেনের মধ্যে দিয়ে-এদের মধ্যে আমার আরো পাচ ছয়জন বন্ধুর দেখা পেলাম।

তাদের সঙ্গে সমস্ত ট্রেন ঘুরতে লাগলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। *এক.* আরো কেউ আছে কি না আমাদের পরিচিত, *দুই.* সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করা।

আমরা কয়েকবার হাটাহাটি করলাম। বেশ কয়েকজনকে পেয়ে আমাদের মিশন সফল হলো। এক পর্যায়ে আমরা ট্রেনের দরজা খুলে ফেলতে চাইলাম বাইরের দৃশ্য দেখবো বলে।

ট্রেন গার্ড আমাদের বাধা দিলেন। তিনি আমাদের শান্ত হয়ে বসতে বললেন।

যার যার সিটে এবার আমরা শান্ত হয়ে বসলাম কিছুক্ষণ। এরই মধ্যে টিকেট চেক হলো। এবার আর গার্ডদের দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের মধ্যে একটি গ্রুপ কার্ড নিয়ে বসলো। আর আমরা আবার পায়চারী করতে লাগলাম এ বগি থেকে ও বগি। এবং এক পর্যায়ে আমাদের বগির দরজা খুলে ফেললাম। কেউ বা বসে, কেউ বা দাড়িয়ে বাইরের নারী-পুরুষদের হাত তুলে হাই বা ফ্লাইং কিস দিচ্ছি। এমনি করে কেটে যাচ্ছিল বেশ।

টাঙ্গাইল ছেড়ে যমুনা বৃজ স্টেশনে পৌছালাম। ট্রেন থামলো কিছুক্ষণের জন্যে। নামলাম একটু বাইরের হাওয়ায়। ট্রেন শব্দ করছে শুনে বগিতে উঠলাম। এরই মধ্যে এখান থেকে অনেকে উঠেছে যার যার গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।

আমার বগিতে উঠে সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম সেলোয়ার-কামিজ পরিহিতা দুজন মেয়ে বসে আছে। দুজনই সুন্দরী।

একজন সামান্য মোটা হলেও অপরজন বেশ স্লিম এবং অনিন্দ সুন্দর।

থমকে গেলাম তাদের দেখে। ভাবছি আমি কি ঠিক বগিতে উঠেছি, নাকি ভুল করেছি।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো এক বন্ধুর ডাকে।

সে বললো, সিট ব্লক, এবার দাড়িয়ে থাক।

লক্ষ্য করলাম, শুধু আমার নয়, আরো দুজনের সিটও ব্লক। অগত্যা আমরা দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকলাম। কেউ ওঠে কি না, উঠলেই গিয়ে বসবো।

এক ফাকে জায়গা পেলাম বসার মতো। গিয়ে বসলাম তাদের মুখোমুখি। পরক্ষণেই একটি দুই তিন বছরের ফুটফুটে বাচ্চা এলো।

বাচ্চাটিকে আদর করে পাশে বসাতে চাইলে আমার মুখোমুখি বসে থাকা দুজনের একজন বললেন, আব্বু, চাচ্চুর পাশে বসো।

ছেলেটি ভদ্রভাবে বসলো।

ইতিমধ্যে তারা দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকা দুজন ভদ্রলোককে ডাকছে এসে বসার জন্যে।

এটা দেখে আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, আপনারা বসেছেন ভালো কথা আবার অন্যকে ডাকাডাকি ঠিক না।

আমরা কয়েকজন তাতে সায় দিলাম।

এবার তারা দুজন থামলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে গেলাম যমুনা সেতুর ওপরে।

আমরা কয়েকজন উঠে গিয়ে দরজায় পজিশন নিলাম সেতু থেকে নদী দেখতে। যতোদূর তাকাই শুধু বালি আর বালি। মাঝে মধ্যে হালকা স্বচ্ছ পানি। গরুর পাল ও কৃষাণের ধান নিয়ে বাড়ি ফেরা দেখে আমরা অভিভূত। বিশেষ করে শাদা ধবধবে বালির স্তর আমাদের মুগ্ধ করলো।

সেতুর শেষ পাড়ে এসে মানবসৃষ্ট বনাঞ্চল দেখলাম যাতে রয়েছে অনেক পিকনিকের গাড়ি।

কিছু পর্যটক সেতুতে ট্রেন চলাচল ফ্রেমে আবদ্ধ করলেন।

আমরা বেশ মজা পেলাম।

এবার কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। বন্ধুদের দিকে তাকাতেই দেখলাম অনেকেই নিস্তেজ। নিজের সিটে আসতেই লক্ষ্য করলাম বাচ্চাটি নেই।

আমরা বসলাম চাপাচাপি করে। ট্রেন চলেছে বিরামহীন গতিতে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়েছে। আমরা অনেকটাই ফৃ হয়ে গিয়েছি মেয়েদের সঙ্গে।

নানান গল্পের মাঝে জানতে পারলাম, তারা দুজন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অনার্স ও মাস্টার্সের ছাত্রী, উভয়েই বিবাহিতা। দাড়িয়ে থাকা দুজন তাদের স্বামী। তারা ওই ইউনিভার্সিটিরই শিক্ষক। তাছাড়া উভয়েরই একটি করে বাচ্চা আছে।

কথাগুলো শুনে আশাহত। ভেবেছিলাম সেও একজন অ্যাপ্লিক্যান্ট আর পাশে বসে থাকা মেয়েটি তার আপা।

হঠাৎ শুনলাম আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলছে, আপনার ছোট কোনো বোন আছে কি?

সে সহাস্যে উত্তর দিচ্ছে, না, আমরা এক ভাই, এক বোন।

মেয়েটির স্বামী এসে ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে তার কোলে দিয়ে গেলেন।

কেউ ঠিকানা চাওয়াতে তিনি তার যোগাযোগের ঠিকানা বললেন।

লক্ষ্য করলাম কেউ কেউ তা টুকে রাখছে।

কিছুক্ষণ পর তার স্বামী এসে বললেন, সব ঠিক করে নাও, আমরা পরের স্টেশনে নামবো।

সব ঠিক করে নিয়ে মেয়েটি বললো, রাজশাহী স্টেশনে নামলে দেখা হবে।

তারা সিট ছেড়ে চলে গেল।

এরপর ট্রেন ইউনিভার্সিটির গেটে থামলো। বন্ধুদের অনেকেই নেমে গেল।

আমি নামলাম রাজশাহী স্টেশনে। স্টেশন পার হয়ে দেখলাম তারা রিকশায় উঠে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মন বলে উঠলো অকৃতজ্ঞ মেয়ে, আমাদের সিটে বসেও একবার ধন্যবাদ জানালো না।

*গাজীপুর থেকে*

# সামান্য পরিচয়ে

**- আনোয়ার আজাদ**

গ্রাম থেকে এসএসসি পাস করে পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছি। থাকি একটা মেসে। আমার রুমমেট এবং আমি এক সঙ্গে একই কলেজে পড়ি।

সবে সেকেন্ড ইয়ারে পদার্পণ করেছি। আমার বন্ধুটি আবার মোবাইল ব্যবহার করে। একদিন দেখি সে খুব মনোযোগ দিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

ভাবলাম ওর বান্ধবী কেউ হবে হয়তো।

প্রায় বিশ মিনিট কথা বলার পর ও বললো, একটা মেয়ে। সে নাম্বার ভুল করে আমার কাছে ফোন করেছিল। তারই সঙ্গে এতোক্ষণ কথা হলো।

আমি জানি যে, অনেকেই নাম্বার ভুল করে ফোন করে। কিন্তু এতোক্ষণ কথা বললো, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগলো।

বললাম, পরবর্তীকালে ফোন করলে আমাকে দিও।

বলতে না বলতেই পরদিন কল করলো। তখন আমি এবং আমার বন্ধু দুজনে পচিশ মিনিট কথা বললাম।

কথা বলে যতোদূর জানলাম, মেয়েটির নাম পলি। ক্লাস টেনে লেখাপড়া করে। বাড়ি হচ্ছে আমাদের খুলনা থেকে দেড়শ কিলোমিটারের মতো দূরে একটা উপজেলা শহরে।

মেয়েটির কথা খুব ভালো লাগলো। বিশেষ করে তার গলার স্বর। সেদিন অবশ্য পরিচয় পর্ব শেষ করেছি। পরিচয় বাদে তেমন কিছুই জানতে পারিনি।

পরদিন আমরা বেশ আগ্রহ নিয়ে দুই বন্ধু তাকে ফোন করি। আধা ঘণ্টার মতো কথা হয় সেদিন। সেদিন জানলাম তার বাবা কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার। দুই বোনের মধ্যে সে ছোট। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য বড় একটা ভাই আছেন। সে মোবাইলে তার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখার জন্য খুব অনুরোধ করলো। সেও লেখার প্রতিশ্রুতি দিল।

তারপর থেকে তার সঙ্গে মোবাইলে এবং চিঠিতে যোগাযোগ শুরু হলো। রং নাম্বারের পরিচয় থেকে হয়ে গেলাম খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এভাবে প্রায় প্রতিদিন সে কল করতো। না হয় আমরা করতাম।

তার সঙ্গে একদিন কথা না বললে সেদিন ভালো কাটতো না।

মোবাইলে সে অনেক টাকা খরচ করতো।

অবশ্য আমরাও কম করতাম না।

একদিন বললো, ছবি পাঠাতে।

আমার বন্ধু ছবি পাঠালো।

আমি পাঠালাম না, ছবি তোলা ছিল না।

এর মধ্যে আমাদের মধ্য পর্ব পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

একদিন রুমে এসে শুনি পলি ফোন করেছে। আমার সঙ্গে কথা বলবে।

ফোন ধরতেই বললো, আমি আপনাদের কাছে আসছি।

কেন?

এসে বলবো। শুধু এটুকু বললো যে, আমি বিকাল পাচটায় ট্রেনে খুলনা আসছি। আপনারা স্টেশনে অপেক্ষা করবেন।

তখন একটা বাজে। দুই বন্ধু সেজেগুজে স্টেশনে চলে গেলাম নির্ধারিত সময়ের আগে।

তার হঠাৎ আগমনের কারণ নিয়ে সাতপাচ ভাবতে লাগলাম।

এর মধ্যে একবার কল করে বললো, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে পৌছাবো।

এদিকে আমরা স্টেশনে ট্রেন এবং অপেক্ষমাণ যাত্রীদের দেখছি। সময় আর যাচ্ছে না।

পাশ থেকে কে যেন বললো, বন্ধু বসে থাকো। সবুরে মেওয়া ফলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এলো।

পলি ট্রেন থেকে নেমে কল করলো এবং বললো, আমি কাছেই একটা মোবাইলের দোকানে।

গিয়ে দেখি একটা মেয়ে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পলি?

বললো, হ্যা।

তাকে নিয়ে এলাম আমাদের রুমে।

এদিকে ট্রেন জার্নি করে সে ক্লান্ত।

বললাম, তুমি কোথায় থাকবে?

কেন, আপনাদের কাছে।

আমার রোমান্টিক মুড নষ্ট হয়ে গেল তার কথা শুনে। কারণ ব্যাচেলর রুমে আমরা আরো অনেক ছেলেদের সঙ্গে থাকি। এখন রাতে তাকে কোথায় রাখবো সেই চিন্তা করতে লাগলাম।

এদিকে আমার বন্ধু তার কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কারণ তার কোনো আত্মীয় এখানে নেই।

এদিকে সে বলছে যে, বাড়ি থেকে রাগারাগি করে এসেছি, আর বাড়ি যাবো না।

ভাবলাম রাতটা যাক, কাল ব্যবস্থা করা যাবে।

অনেক ভেবে বুদ্ধি করলাম আমার কাকার বাড়িতে কাকিকে মিথ্যা কথা বলে রাখা যায় কি না। কাকিকে গিয়ে বললাম আমার বন্ধুর বোন। বাড়ি থেকে রাগ করে এসেছে।

কাকি বললেন, তাহলে আমাদের এখানে নিয়ে আয়।

তাকে কাকাদের বাসায় নিয়ে গেলাম। বললাম, আসল পরিচয় দেবে না। তাহলে কাকা তোমার সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেলবেন।

টেনশনে সেদিন রাতে ঘুম হলো না। সকালে অনেক বুঝিয়ে তাকে রাজি করালাম বাড়ি যাওয়ার জন্য। এবং সে রাজি হলো।

পরদিন পরীক্ষা শেষে তাকে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিকেট কেটে দিলাম।

নির্ধারিত সময়ে গাড়ি এলে তাকে উঠিয়ে দিলাম।

সে চলে গেল।

সেদিন একটা বিষয়ে অবাক না হয়ে পারলাম না যে, একটা মেয়ে কি করে সামান্য পরিচয়ে এতোদূর একা একটা ছেলের কাছে চলে আসে যে কি না কোনোদিন খুলনা আসেনি, যাকে কোনোদিন দেখেনি!

প্রচণ্ড বিশ্বাস করেছিল সে আমাদের।

আমরাও তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছি।

এখনো আন্তঃনগর ট্রেন দেখলে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে।

*খুলনা থেকে*

# প্রতারক প্রেম

- খন্দকার নাজমুল

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার উত্তরায় আসবো। উদ্দেশ্য আমার বন্ধু রাজুর জন্মদিনে আসা। টিকেট কেটে ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায় আছি। এমন সময় কেউ যেন আমার পাশে এসে বসলো। তা বুঝতে পারলাম।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ট্রেন ছাড়লো। বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি পাশে বসা একটি মেয়ে। মনে মনে ভাবলাম, একটি মেয়ের সঙ্গে বসে আছি আর আমি শালা এতোক্ষণ কোন ধান্দায় ছিলাম।

ভ্রমণে পাশে মেয়ে থাকার মজাই আলাদা। চুপচাপ বসে আছি। দুজনার মাঝে কোনো কথা নেই। ভেবেছিলাম মেয়েটিই আগে কথা বলবে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ভাবছি আমিই কিভাবে শুরু করবো। এমন সময় ব্যাগ খুলে কি যেন বের করছে। সেটা অন্য কিছু নয়, যায়যায়দিন।

যাহোক, কথা বলার একটা সুযোগ পেলাম।

ম্যাডাম, আপনি কি এটার নিয়মিত পাঠক।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, কেন?

মানে, আমি এটার নিয়মিত লেখক এবং পাঠক।

তাই!

হ্যা যদি নিয়মিত পড়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার লেখা পড়েছেন।

আপনার নাম?

খন্দকার নাজমুল।

হতে পারে আপনার লেখা পড়েছি। এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তবে নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি এই জন্য যে, যায়যায়দিন আমার খুবই প্রিয়, তাছাড়া আপনি এর লেখক আর ভ্রমণটা আপনার সঙ্গেই।

যদি আমার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন তবে আগে ধন্যবাদ জানান সম্পাদককে। তিনিই আমাকে লেখক হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, যায়যায়দিনই একমাত্র মাধ্যম যেখানে আমাদের হাসি, কান্না, সুখ, লুকিয়ে থাকা দুঃখগুলোকে প্রকাশ করা যায়। সত্যিই যায়যায়দিনের ঋণ শোধ করার নয়।

হঠাৎ মেয়েটি হেসে উঠলো।

কেন হাসছেন? হাসির তো কিছু বলিনি।

তা বলেননি। তবে যেভাবে প্রশংসা করছেন, সম্পাদক জানতে পারলে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুজে পেতেন না।

বললাম, যিনি প্রশংসার যোগ্য তার প্রশংসা না করাটাই কি বিধাতার হুকুমের লংঘন নয়?

হ্যা, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন।

আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার পরিচয়টা তো জানা হলো না।

নাম হচ্ছে তুলি। বাসা উত্তরায়। ময়মনসিংহে বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর আপনি?

বাসা ময়মনসিংহ। যাচ্ছি উত্তরায় বন্ধুর বাসায়।

বাহ, আমি বন্ধুর বাসা থেকে আসছি আর আপনি যাচ্ছেন।

এভাবে আলাপে আলাপে কখন যে উত্তরা এয়ারপোর্ট রেলস্টেশনে এসে পৌছালাম বুঝতেই পারলাম না।

ট্রেন থেকে নেমে তুলি বিদায় নিয়ে একটি রিকশাযোগে চলে গেল।

আমি চলে গেলাম মার্কেটে।

বন্ধুর জন্য গিফট কিনে নিয়ে বাসায় এলাম।

কেক কাটা হবে রাত আটটায়।

নির্ধারিত সময়ের আগে একে একে অতিথিরা আসতে থাকেন।

আমি আর রাজু অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে আগমন ঘটে ট্রেন পরিচয় তুলির। খুবই অবাক দৃষ্টিতে দুজন দুজনার প্রতি তাকালাম।

আপনি এখানে?

আমি রাজুভাইয়াদের বাসার চার তলায় ভাড়া থাকি। কিন্তু আপনি?

আমি রাজুর বন্ধু।

তাই!

কেক কাটার সময় রাজুর পাশে দাড়িয়েছি।

অতিথিদের সবার নজর কেক কাটার প্রতি। আর বাকা চোখে দেখছিলাম তুলিকে। যতোই দেখছি ততোই যেন ভালো লাগছে।

আমার বার বার তাকিয়ে থাকা তুলির নজরে পড়লো।

অনুষ্ঠান শেষে গেটে দাড়িয়ে আছি তুলিকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। চলে যাওয়ার সময় বললাম, আপনি খুবই সুন্দর।

তুলি সুন্দর একটি হাসি দিয়ে বললো, প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। চলি, আবার দেখা হবে।

চলে যাওয়ার পর রাজুকে জানালাম তুমিকে আমার ভালো লাগার কথা। বললাম, তুলির সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক করিয়ে দিতে।

রাজু প্রথমে রাজি না হলেও আমার বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো।

রাজু পরদিন তুলিকে জানালো আমার ভালো লাগার কথা।

প্রথম প্রস্তাবেই তুলি সম্মতি জানালো।

শুরু হলো ভালোবাসা। যেন স্বর্গীয় সুখ।

এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ময়মনসিংহ থেকে উত্তরায় আসতাম তুলির সঙ্গে দেখা করতে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলো ফোনে কথা হতো।

কোনো কারণে তুলির সঙ্গে দেখা করার আগে ঠিক করা সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহ থেকে উত্তরায় আসতে না পারলে দেখা হতো না। তখন রাজুদের বাসায় এসে গৃল ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম। তুলি কখন কলেজ থেকে বাসায় ফিরবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাসায় ফিরতো। তখন চোখে চোখ রেখে ইশারায় কিছু কথা হতো। এভাবেই আমাদের ভালোবাসা চলতে থাকে।

এক রাতে আমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। কথা হয় তুলির সঙ্গে। তুলি বললো, আগামী শুক্রবার অবশ্যই ঢাকায় আসবে শত ব্যস্ত থাকলেও। মিস করো না। আসতেই হবে। এতোটুকু বলেই লাইন কেটে দেয়।

বুঝতে পারিনি এ শুক্রবারই হবে আমার জীবনের একটি যন্ত্রণাময় স্মৃতি। শুক্রবার ঢাকায় আসি। দেখতে পাই রাজুদের পুরো বাসায় রঙ-বেরঙের বাতিতে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

রাজু আমাকে ওর রুমে নিয়ে বললো, বন্ধু, পৃথিবীতে বেচে থাকলে দুঃখ যন্ত্রণার মাঝে বেচে থাকতে হয়। এটাই নিয়ম। এই বলে হাতে একটি চিঠি ও বিয়ের কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললো, তুলি দিয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল,

*নাজমুল,*

*শুভেচ্ছা নিও। এতোদিন ভালোবাসার নামে শুধুই মজা করেছি। এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। মনে কষ্ট নিও না। পারলে ক্ষমা করো, না হয় অভিশাপ দিও।*

*ইতি –*

*তোমার প্রতারণাকারিণী প্রেমিকা তুলি।*

চিঠি পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। চোখের সামনে দিয়ে মনের মানুষটি অন্যের হাত ধরে চলে যাবার দৃশ্য কতো বেদনাদায়ক তা কাগজ কলমে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঢাকা এলে আজো রাজুদের বাসায় আসি। কিন্তু তুলিকে দেখি না। শুধু কল্পনার চোখে তুলির ছবি ভেসে ওঠে। চোখের দুফোটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে তা বরণ করে নিই। তুলিকে আজো ভালোবাসি, ভালোবাসবো মৃত্যুর পরও।

*মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ থেকে*

# বাঘের ভয়

বিয়ে হয়েছে প্রায় আড়াই বছর হলো। বৌকে ছাড়া একনাগাড়ে বাইরে কোথাও থাকার অভ্যাস হয়ে ওঠেনি। আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসি। একজনকে ছাড়া আরেকজন থাকতে পারি না, অনেকটা ওই রকম ভালোবাসা।

তবে এবার থাকতে হবে। অর্থাৎ সিলেট ক্যান্টনমেন্টে প্রায় তিন মাসের কোর্স। ছুটি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার ওপর সিলেট ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকার রায়ের বাজার আসা প্রায় সব মিলিয়ে আট ঘণ্টার জার্নি।

শুক্রবার কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে আসবো সেটাও এ কারণে বেশ ঝুকিপূর্ণ। কিন্তু ওই যে মনের টান। আর এভাবেই আমরা কয়েকজন অফিসার মিলে প্ল্যান করলাম সামনের উইকএন্ডে ঢাকা যাবো। এবং সেটা হবে ট্রেনে।

নির্ধারিত দিনে যথাসময়েই আমরা চারজন সিলেট নতুন রেলস্টেশনে পৌছালাম। টিকেট কেটে নির্ধারিত আসনে বসলাম। দুপুরের ট্রেন *পারাবত*।

ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তেই আমাদের একজন আতঙ্কিত হয়ে বললো, দোস্ত আমাদের মনে হয় দেখে ফেলেছে। ... স্যার ট্রেনে উঠেছেন।

টেনশনে পড়ে গেলাম। গোপনে জানতে পারলাম আমাদের সামনের বগিতেই ওনার আসন। পারমিশন ছাড়া যাচ্ছি, দেখে ফেললে সর্বনাশ!

পুরোটা জার্নি নিজেকে আড়াল করে সামনের বগির দরজার দিকে কড়া নজর রেখে গেলাম। আর মনে মনে প্ল্যান করলাম কমলাপুর পৌছামাত্রই নেমে দ্রুত হাটা দেবো বের হওয়ার জন্য। স্যারের আগে বের হতে হবে। ঢাকা পৌছার পর কয়েকবার চেষ্টা করলাম যে ট্রেনটা যদি সামান্য স্লো করে তবে লাফ দিয়ে নেমে যাবো। সেটা হলো না। তারপর কমলাপুর পৌছামাত্রই সোজা হাটা দিলাম। কিন্তু *যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়*।

যা হয় আর কি! টিকেট চেকিং ক্রস করা মাত্রই দেখি স্যার দাড়িয়ে আছেন সামনেই। তবে অন্যদিকে ফিরে। কোনো রকমে লোকজনের আড়াল নিয়ে আপাতত সে যাত্রা থেকে রেহাই পেলাম। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর নয় ট্রেন ভ্রমণ, *আল মোবারাকাহ* বা *শ্যামলী*-ই ভালো।

এরপর থেকে প্রতিবারই উইকএন্ডে যেতাম। বৌয়ের ভালোবাসা আর রেখে আসা এক মাসের আব্বুটাকে একটু আদর করার জন্য বাসেই যেতাম। যখন-তখন গাড়ি পাওয়া যেতো। কোনো সমস্যা হতো না।

ট্রেন ভ্রমণের ওই তিক্ত অভিজ্ঞতার মতো বাসে কিছু ঘটনি।

জনৈক **আর্মি অফিসার**

*ঘাটাইল, টাঙ্গাইল থেকে*

# সিতি

সকাল সাড়ে দশটা। ৩১ মার্চ ১৯৯৯ সাল। বসে আছি কুয়ালা লামপুর ইন্টারন্যাশনাল রেল স্টেশনে। স্টেশনটির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাংকক এবং সিংগাপুরের ট্রেনের।

আমার গন্তব্য ব্যাংকক।

ট্রেন তখনোও আসেনি। পৌনে বারোটার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি আর আকাশ পাতাল ভাবছি। জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণ কেমন হবে? দেশে থাকতে কখনো ট্রেনে ওঠা হয়নি। ট্রেন ভ্রমণ সম্পর্কিত গল্প উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের রঙমাখা কাহিনী পড়েছি। পত্রপত্রিকাতেও অনেকের ব্যক্তিগত রগরগে গল্প হজম করেছি। এখনো ভাবছি যদি ক্যাবিনে কোনো ষোড়শী বিদেশিনী পেয়ে যাই তবে জার্নিটার মূল্যায়ন অন্য রকম হয়ে যাবে।

কি জানি যদি এমন কিছু হয়েই যায়!

ট্রেন সমাগত। লাগেজটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে টিকেট বের করে ট্রেনে উঠে গেলাম। কিন্তু একি! ক্যাবিনে মোট চারটি আসন। ক্যাবিনটা যদি চতুর্ভুজ হয় তবে এর চার কর্নারে চারটি আসন পাতা। বাম পাশের দুটি মুখোমুখি। ডানেও তাই। ক্যাবিনে মোট তিনজন যাত্রী আছি। আমার সামনের আসনে কোনো ষোড়শী তো দূরে থাক, কোনো পাখিও নেই। মনে মনে আহত হলাম।

ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করলাম। যদিও একবার পড়ে শেষ তবুও আবার পড়ার চেষ্টা করছি। সিলেক্টেড কিছু গল্প পড়তে পড়তে এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

মৃদু আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। আমাদের ট্রেনটি বাটারওয়ার্থ স্টেশনে দাড়িয়েছে। হস্টেস জানিয়ে দিলেন এ ট্রেন এ পর্যন্তই যাবে। এখানে ট্রেন চেঞ্জ করতে হবে। এবং পরবর্তী ট্রেন রাত সাড়ে আটটায়।

কি আর করা! বিকাল চারটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি ছাড়া উপায় নেই।

বাটারওয়ার্থ থেকে পেনাং আইল্যান্ড যেতে হলে বৃজ পার হওয়া ছাড়াও এই সাড়ে তেরো কিলোমিটার বৃজের পাশ দিয়েই ফেরি চলাচল ব্যবস্থা আছে। ফেরিতে পারাপার ভাড়া মাত্র 60 Sen। শুধু এক পাশে ভাড়া দিতে হয়। এর আগে আমি পেনাং আইল্যান্ডে কোনো কারণ ছাড়াই একদিনে সতেরোবার ফেরি পার হয়েছি। অল্প যাত্রী বিশিষ্ট দোতলায় বেঞ্চে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে।

রাত সাড়ে আটটা পার করতে হলে সবচেয়ে ভালো হবে ফেরিতে করে একবার ওপার যাওয়া আবার ফিরে আসা। আবার ওপার যাওয়া আবার ফিরে আসা এমনই করা।

সোয়া আটটার দিকে স্টেশনে ফিরে এসে ট্রেনের খোজ নিয়ে নির্দিষ্ট বগিতে আসি। হঠাৎ কিছু দেখার মতো চমকে উঠি। *বিশ্বাসে মিলায় বস্তু*। আসলে আমার তো বিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বস্তু কিভাবে...?

শুধু হাই বলে বসে পড়ি আমার আসনে। লাগেজ ঠিকঠাক মতো রেখে একটা বই হাতে নিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালাম। মেয়েটির রূপের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি কবি সাহিত্যিকরা আসলে এমন মেয়ে দেখলে কাগজ কলম দিয়ে তুলকালামকাণ্ড করেই ফেলবেন। শুধু এটুকুই বলতে পারি, মালয় মেয়েদের মতো ঠোঁট পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশ বা জাতীয় মেয়েদের আছে কি না সন্দেহ। হুমায়ূন আহমেদের একটা বইতে মালয় মেয়েদের ঠোঁটের সামান্য বর্ণনা আছে।

ছেলেদের বেতনের কথা আর মেয়েদের বয়সের কথা বলা উচিত নয়। ছেলেদের বিষয়টি কতোটা সঠিক জানি না। তবে মেয়েদের বয়সের ব্যাপারটা শুধু বাংলাদেশের জন্য সঠিক।

মেয়েটির নাম সিতি হাসমা। পাঠক বিভ্রান্ত হবেন না। কারণ ড. মাহাথির মোহাম্মদের স্ত্রীর নামও ড. সিটি হামসা। সিতির বয়স বিশ বছর সাত মাস। পেশায় আইটির ছাত্রী। পেমাং সায়েন্স ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

ট্রেনে সিতি একা নয়, সঙ্গে তার মা আছেন।

তবে আমার জন্য সুখের আর সিতির জন্য দুঃখের ব্যাপার হয়েছে, ওর মায়ের সিট পড়েছে আমাদের এক ক্যাবিন পরে গিয়ে। তবুও এদের কাছে এসব কোনো ব্যাপারই না। রাত, দিন অথবা একা এদের জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র হেরফের করতে পারে না।

এরই মধ্যে হস্টেস এসে বিছানা তৈরি করতে লাগলেন।

আমরা তখন দাড়িয়ে গল্প করছি।

বিছানা তৈরি হলে সিতি দোতলা খাটের ওপরে চলে গেল। আমি নিচেই।

এরও খানিক পরে গুডনাইট বলে সিতি ঘুমোতে গেল।

কিন্তু আমি?

আমার তো আর ঘুম হবে না। এমন একজন যে কি না আমার থেকে মাত্র দুই হাত উপরে শুয়ে আছে। নেই কোনো বেড়া দেয়া অথবা নেই কোনো দেয়াল তোলা। ইশ, কি যে করি!

আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে এক সময় ট্রেন বর্ডারে এসে থামলো। সবাইকে বিনীত অনুরোধ জানানো হলো ইমেগ্রেশন সংক্রান্ত কাজ শেষ করে আসর জন্য।

নেমে গেলাম। ফিরে এসে দেখি সিতি আমার আগেই এসে নিজের আসনে ফিরে গেছে। হলো না কোনো কথা। আবারও আবোল-তাবোল ভাবছি।

এক সময় নিদ্রাদেবীর কোলে ঠাই নিলাম। মানুষের পায়ের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো। দেখি থাইল্যান্ডের হাট ইয়াই নামের এক শহরে ট্রেনের যাত্রাবিরতি। বাথরুম থেকে চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে বাইরে গিয়ে কফি শপের সামনে দাড়িয়ে আছি। এমন সময় হঠাৎ নজরে এলো সিতি এদিকেই আসছে। সঙ্গে একজন মহিলা।

সিতি পরিচয় করিয়ে দিল ওর মায়ের সঙ্গে। মহিলার বয়স দেখতে কোনোভাবেই বত্রিশ তেত্রিশের উপরে মনে হবে না। অদ্ভুতভাবে এরা বয়স চুরি করতে শিখেছেন। সিতির মাকে ম্যাডাম বলে সম্বোধন করি। ম্যাডামকে ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রণ জানালাম পাশের কফি শপে।

হাট ইয়াই-তে প্রায় ঘণ্টা খানেক ট্রেন থামবে। আমরা হাট ইয়াইতে কিছুটা ঘুরে দেখেছিলাম শহরটিকে। সিতির বাবা একটি কোরিয়ান কম্পানির ম্যানেজার। সম্প্রতি কম্পানির সব প্রডাক্টিভ স্টাফ এবং কর্মচারীদের থাইল্যান্ডে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সিতি এবং সিতির মা যাচ্ছেন সিতির বাবার সঙ্গে দেখা করতে। প্রায়ই তারা যাতায়াত করেন।

আমরা ফিরে এলাম ট্রেনের বগিতে। কথার ঝুড়ি বিছিয়ে ধরলাম সিতির আসনে। আর সিতিও মুগ্ধ শ্রোতার মতো আমার সব কথা শুনে যাচ্ছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। মালয়শিয়াতে একমাত্র চায়নিজ জাতি ছাড়া মালয় এবং ইনডিয়ান বংশোদ্ভুত তামিল মেয়েরা বাঙালিদের খুব পছন্দ করে। তবে পছন্দের প্রথম কথা হচ্ছে স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম হতে হবে। অথবা দ্বিতীয়ত. প্রচুর টাকা পয়সা থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের মোটামুটি যা আছে তা হলো প্রথমটি। এবং এটাকেই এখন কাজে লাগতে হবে।

সিতিকে ইমপ্রেস করার সমস্ত কৌশল কাজে লাগালাম। আমার কথা বলার ধরণে বিশেষত মালয় ভাষাটাকে মোটামুটি শুদ্ধ করে বলার চেষ্টা করি যা অন্য পাচজন বাঙালির চেয়ে ব্যতিক্রম। আর চেহারা নায়কের মতো না হলেও নায়কের কাজিন বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

বন্ধুরা তো বলেই, মামা, খালু থাকলে তুই ফেরদৌসের মতো সিনেমা বাজার মাত করতি।

থাক সেসব কথা। আমার জার্নির প্রথম অর্ধেক দিন ও এক রাত পার হয়ে আরো একটি পূর্ণ দিবস পার হতে যাচ্ছে। বকবক করেই যাচ্ছি।

রাত নয়টার মতো বাজে। হস্টেস এসে বিছানা পেতে দিলেন। মশারি টাঙিয়ে দিলেন।

সিতি উঠে দাড়ালো তার নিজ বিছানায় যাওয়ার জন্য।

সিতি চলে গেল তার বিছানায়। কিন্তু আমাকে রেখে গেল এক সাগর কষ্ট দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে। আমার তো ঘুম হারাম। সিতিকে নিয়ে কি করা যায় সেসব ভাবছি। এপাশ–ওপাশ করতে করতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। মনে হচ্ছে আশপাশের সকলে ঘুমে অচেতন। উঠে টয়লেটে গেলাম। যদিও টয়লেটের কোনো কাজ ছিল না তবুও গেলাম।

ফিরে এলে সিতি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, *বেলাম টাইডর থাগি কা ?* এখনো ঘুমাওনি?

তার মানে আমার মতো সিতিও তাহলে জেগে আছে!

পাল্টা প্রশ্ন করলাম, যদি প্রশ্নটা আমি তোমাকে করি? *আকু মাহু জওয়াব দুলু ?*

উত্তরটা আমি আগে চাই। সিতি বললো।

তোমাকে নিয়ে ভাবছি তো, তাই ঘুম আসছে না। আর ভাবছি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কিভাবে করা যায়।

এবার সিতি রহস্যভরা কণ্ঠে বললো, *কাউ মায়া দেগিল লা* – তুমি খুব দুষ্টু।

এর খানিকক্ষণ পরে সিতি নেমে টয়লেটে গেল। রাতও অনেক হয়েছে। বারোটা তো হবেই। এই সুযোগে আমার খাটের ভারী মশারি সিতির আগমনের জন্য অবারিত করে রাখলাম।

যখন সিতিকে দেখলাম টয়লেট থেকে ফিরে আসছে এমনি সিতিকে বললাম, এসো আমার বিছানার ওপর বসো। গল্প করি।

সিতি বিনা বাক্য ব্যয় আমার বিছানার ওপর উঠে বসলো।

মশারি নামিয়ে দিলাম।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে এবার অন্য গল্প শুরু করলাম।

সিতিকে বললাম, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন যেভাবে ঠিক সেভাবেই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

এই বলে সিতির মাথাটা টেনে আপন কোলের ওপর সেট করলাম। আমার হাত দুখানা সিতির মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলাম আর বলতে লাগলাম –

*মণি ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো*
*বর্গি এলো দেশে*
*বুলবুলিতে ধান খেলো*
*খাজনা দেবো কিসে।*

আস্তে আস্তে আমার মাথাটাও নিচু করে ঠোট দুটো সিতির কপাল ছুয়ে দিল। নাক ছুয়ে দিল, কান ছুয়ে দিল, চিবুক ছুয়ে দিল, এবার ঠোট দিয়ে ঠোট ছোয়ার পালা শুরু হলো।

সিতিও সাদরে গ্রহণ করেছিল। এবার যেন প্রতিযোগিতা চললো কে কার ঠোট থেকে কতোটুকু রস সংগ্রহ করতে পারে।

শুরু হলো বস্ত্র অপসারণ প্রক্রিয়া। সে রাতে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে কতোটা সফল ছিলাম জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারি, সিতি পুরো প্রক্রিয়াটা তৃপ্তি সহকারে এনজয় করেছে।

এক সময় সব থেমে গেল।

সিতি পুরো রাত আমার কাছেই ছিল।

পরের দিন বিকাল তিনটায় ট্রেন ব্যাংককে পৌছায়।

আমরা ফোন নাম্বার বিনিময় করে যে যার মতো রাস্তায় পা বাড়াই।
সিতি এখন স্বামীসহ ইংল্যান্ডে থাকে।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মালয়শিয়া থেকে*

# একাকী একদিন

## - নাহিদ সুলতানা

আকাশ গ্রামের ছেলে। পড়ালেখায় বেশ ভালো। সে গ্রামের স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছিল। দুই চোখে অনেক স্বপ্ন। ক্যাডেট কলেজে পড়বে। জীবনে অনেক বড় হবে। সেই লক্ষ্যে পড়াশোনা করে যাচ্ছে।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় ক্যাডেট কলেজে পড়ার ইচ্ছার কথা বাবা মাকে জানালো। কিন্তু ছেলের এই ইচ্ছার কোনো মূল্যায়ন করলেন না তার স্বল্প শিক্ষিত বাবা মা। অনন্যোপায় হয়ে সে তার গ্রামের এক বড় ভাইকে মনের ইচ্ছাটা খুলে বললো।

তারপর বাড়িতে কিছু না বলে একদিন ওই বড় ভাইয়ের সঙ্গে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে গিয়ে ভর্তি ফরম পূরণ করে এলো।

যথাসময়ে ইন্টারভিউ কার্ড এলো। ও ভাবছে সেই বড় ভাইও তো এখন গ্রামে নেই, কি করা যায়? কাকে নিয়ে যাওয়া যায়? এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল ও একাই যাবে পরীক্ষা দিতে যাই থাকুক কপালে।

প্রতি মাসে সে যে টাকাটা বৃত্তি পেতো তা সঞ্চয় করতো। নির্দিষ্ট দিন খুব ভোরে আকাশ কাউকে কিছু না বলে কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লো। যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু এবং শেষ হলো।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। আকাশ ভাবলো, আসার সময় যেহেতু বাসে এসেছি, তাই এখন ট্রেনে গেলে হয়তো ভালো লাগবে। আকাশ মির্জাপুর থেকে বাসে ময়মনসিংহ এসে সোজা রেলস্টেশনে চলে গেল।

স্টেশনে গিয়ে আকাশ দেখতে পেল একটা লোকাল ট্রেন লাইনে দাড়িয়ে আছে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো এটি কিশোরগঞ্জ যাবে।

আকাশ ট্রেনের টিকেট কেনার জন্য কাউন্টারের দিকে যাওয়ার সময় *মামা* ডাক শুনে চমকে দাড়িয়ে গেল। কি ব্যাপার? মামা বলে ডাকলো কে? সে অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছিল ভুল শুনেছে কি না।

তখনি একটি লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বললো, আরে মামা, কতোদিন পর তোমাকে দেখলাম! বেশ বড় হয়ে গেছো। চলো বাসায় চলো। তোমার মামি তোমাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হবে।

আকাশ বোকার মতো দাড়িয়ে থেকে ভাবলো এ মামাকে তো কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কি জানি, পাড়া-প্রতিবেশী সম্পর্কীয় মামা হতে পারে হয়তো। লজ্জায় কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না।

লোকটি তার বাবা মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলো। আবারও বাসায় যেতে পীড়াপীড়ি করার পর আকাশ যেতে সম্মতি প্রকাশ না করায় এবার লোকটি বললো, ঠিক আছে, তুমি বাসায় যখন যাবেই না তখন চলো তোমাকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসি।

আকাশ কিছু না বলে লোকটির পিছু পিছু গিয়ে ট্রেনে উঠলো।

লোকটি তাকে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে বললো, টিকেট করেছো?

আকাশ বললো, না মামা, টিকেট করিনি।

ঠিক আছে, আমি তোমার টিকেট নিয়ে আসি। তুমি বসো।

আকাশ বললো, মামা টাকা নিয়ে যান।

ঠিক আছে দাও।

টিকেট কেনার জন্য আকাশ বিশ টাকা দিলে লোকটি বললো, আর কতো টাকা আছে তোমার কাছে? সবগুলো দাও। পথে তোমার খাওয়ার জন্য কিছু নিয়ে আসি। পথে ভাংতি টাকার দরকার হতে পারে। তাই ভাংতিও নিয়ে আসি।

আকাশের পকেটে তখন সত্তর টাকার চেয়ে কিছু বেশি ছিল। সে সরল বিশ্বাসে লোকটির হাতে সত্তর টাকা তুলে দিল।

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। লোকটি সেই যে গেল আর কোনো দেখাই নেই।

আকাশের মনে একটু খটকা লাগলো। এদিকে ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে। পাশে বসা লোকজনকে ঘটনাটা বললো। শুনে সবাই বললো, তুমি ঠগের পাল্লায় পড়েছো।

বিভিন্ন কথা বলে সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

নিজের বোকামির কথা ভেবে রাগে-দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছা করছিল।

ট্রেন ছুটে চলছিল সামনের দিকে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা দেখার মতো মনের অবস্থা তার নেই। মাথায় নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। টিটি টিকেট চেক করতে পারে ভেবে তার খুব ভয় করতে লাগলো। এরই মাঝে ব্যাগের পকেট হাতড়ে আরো কয়েকটা খুচরো টাকা পেল।

এবার আকাশ সিদ্ধান্ত নিল কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনের আগে নীলগঞ্জ নামে ছোট্ট যে স্টেশনটি আছে সেখানে নেমে যাবে। তাহলে তার টিকেট চেক করার ভয়টা থাকবে না। কিন্তু ছোট একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো, ওই স্টেশনে প্রায়ই কোনো ট্রেন থামে না। সে একদিন দেখেছিল যে, ট্রেন না থামলেও গতি খুব কমে যায়। ফলে দুই চারজন লোক লাফ দিয়ে নেমে যায়।

ট্রেন নীলগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি আসার আগেই আকাশ ব্যাগ কাধে দরজার সামনে দাড়ালো। ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই সাহস করে দিল লাফ। এমন সময় অনুভব করলো তার একটা পায়ে কেমন জানি একটু ঘূর্ণি লেগেছে! নিজের অজান্তেই পা-টা একটানে সরিয়ে আনলো। ট্রেনের গতি যতোটা কম ভেবেছিল, বাস্তবে ততোটা কম নয় বুঝতে পারলো।

ঘাসের ওপর আকাশ কতোক্ষণ পড়েছিল মনে নেই।

এই ছেলে, তুমি এখানে শুয়ে আছো কেন ডাকে তার ঘোর কাটলো।

স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় নিল। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি মনে পড়তেই শিরদাড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোতধারা নেমে গেল। আস্তে আস্তে উঠে দাড়িয়ে আকাশ বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

*পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, কিশোরগঞ্জ থেকে*

# জীবন থেকে নেয়া

১৯৯৮ সালের কোনো একদিন হবে। গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সেরে ঢাকা থেকে ফিরছি। আখাউড়া-ঢাকা-আখাউড়াগামী *এসএস কার* ট্রেনের এক বগিতে উঠে বসি। আমার গন্তব্য শ্রীনিধি স্টেশন। লোকাল ট্রেন। তাই সময় ঠিক রাখা কঠিন বৈকি।

সন্ধ্যার সময় মেথিকান্দা স্টেশনে ট্রেন থামলে বগির সব যাত্রী নেমে যায়। বাইরে জ্যোৎস্নার আলো ঠিকরে পড়ছে। আলোবিহীন বগিতে জানালার পাশে বসে সিগারেট ফুকছি। আবছা আলো আধারিতে লক্ষ্য করছি, আমার সামনে মুখোমুখি অবস্থানে জানালার পাশেই একমাত্র বৃদ্ধা যাত্রীটি বসা। অর্থাৎ সারা বগিতে আমরা দুজন মাত্র যাত্রী অবশিষ্ট আছি।

হঠাৎ মহিলাটির কিছু কথা আমার কর্ণগোচর হলো। শাড়ি প্যাচানো শরীরে এলোমেলো শাদাকালো কেশধারীটি একাকী বিড়বিড় করে কিসব আজেবাজে বকে যাচ্ছেন। এই যেমন, দুপুরে তেজগাও থেকে ট্রেনে উঠেছি, আখাউড়া যাবো, ওখানে স্বামী ব্যবসা করে, সঙ্গে টাকা নেই, পেটে ক্ষিধে লেগে গেছে ইত্যাকার খিস্তিখেউড় করে যাচ্ছেন।

ভাবলাম পাগল হবে।

ট্রেনও মেথিকান্দা থেকে ছাড়ছে না।

মহিলার বকবকানিটাও ভালো শোনাচ্ছে না।

কিছুটা বিরক্ত বোধ করছি। তার কথা যেন শুনছিই না এমন ভান করে আছি।

আমার দিক থেকে কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে এক সময় একটি সিগারেট চাইলেন।

আমার তো চমকে ওঠার অবস্থা। সিগারেট খান!

জবাবে আমতা আমতা স্বরে জড়তা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, গাড়িতে চড়তে চড়তে পুরুষদের মুখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে।

তাহলে ধূমপান শেখার মূল দোষটা তিনি আমাদের ওপরই চাপিয়ে দিলেন?

কথা না বাড়িয়ে একটা স্টার সিগারেট দিলাম।

তৃপ্তির সঙ্গে টানছেন আর যা তা বলে যাচ্ছেন।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাইরে তাকিয়ে আছি উদাস ভঙ্গিতে। পরের স্টেশনে নেমে যাবো। তাই ভাবছি কখন ট্রেন ছাড়বে অস্বস্তির অবসান হবে।

আবারও তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি বিনয়াবনত হয়ে কাতর স্বরে পেটে ক্ষিধের কথা জানিয়ে কিছু টাকা চাইলেন।

এবার ধমকের সুরে বললাম, তুমি কোথায় যাবে, কি করবে, অথচ সঙ্গে টাকাকড়ি আনোনি। কেন?

উত্তরে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হলো বাসা তেজগাও। যাবেন আখাউড়া স্বামীর ব্যবসাস্থলে। ভাবতে পারেনি ট্রেন এতোটা লেট হবে।

আমিও পাল্টা বলে দিলাম, তাহলে ওখানে গিয়েই খেয়ো।

কিন্তু না, তিনি ছাড়বার পাত্রী নন।

তওবা পড়ে এ পেতনি তাড়ানো যাবে না।

সাউন্ড কমিয়ে ফিশফিশিয়ে বললেন, গাড়ি ছাড়লে তিনি আমার শরীর মালিশ করে দেবেন। তার বিনিময়ে যেন কিছু টাকা দিই।

মুহূর্তের মধ্যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। বুকের মাঝখানে ঠকঠক আওয়াজ। কোথায় যেন চিন চিনে ব্যথা অনুভব করছি। সারা শরীরে বিদ্যুতের ঝলক যেন বয়ে যেতে থাকে। জীবনে এতোটা বয়সে নিজেকে নারীসঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি অতি সযতনে। শৈশবে একমাত্র মায়ের আদর ছাড়া বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার মতো সে সময়ই পাইনি। যদিও স্কুল কলেজে পড়াকালীন দুয়েকজন সুন্দরী সহপাঠীর প্রেম প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম এবং সে যাত্রায় সফলও হয়েছিলাম। অথচ আজ এই মুহূর্তে আলো আধারির রজনীতে কুৎসিত একটা ভিখারি বেশি রসকষহীন বৃদ্ধার অসংলগ্ন শুনে আমার কাম প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। সংযত হতে তো পারছিই না, বরং হাজার ভোল্টের তড়িৎবাহী বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে দেহ-মনে, আনাচে-কানাচে। মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভয়ানক ঝড়। আমি আজ ব্যর্থ, পরাজিত হতে চলেছি।

দশ টাকার নোটটি ধরিয়ে দিতেই সানন্দে হাতে নিয়ে আচলে বেধে আমার আদেশের অপেক্ষা না করেই আসন ছেড়ে উঠে মাথায় হাত বোলায়। একে একে তার হাত নিচে যেতে থাকে।

ইতিমধ্যেই ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে কিছুই বলতে হয়নি, ঠায় বসে আছি।

সাপুড়ে যেমন খেলা দেখার নিমিত্তে বন্ধ ঝুড়ির ঢাকনা খুলে প্যাচিয়ে থাকা সাপকে খোচা দিয়ে ফুসিয়ে তোলে ঠিক তেমনি মহিলাটি আমার সামনে এক পর্যায়ে মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে আমার প্যান্টের জিপার খুলে ফেলে। হাত দেয় তারও নিচে শর্ট প্যান্টের ভেতরে। টেনে বের করে তাকে...

মাত্র কয়েক মিনিটেই ঝড় শেষ।

নির্ধারিত স্টেশনে ট্রেন থামলে তাড়াতাড়ি প্যান্ট ঠিক করে কোটে পড়ি।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*নরসিংদী থেকে*

## চলন্ত

**- রনবীর কুমার পাল**

মানুষের জীবনে কতো যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায় তার কোনো হিসাব নেই। আমাদের পারিবারিক জীবনেও ঘটেছে এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আমাদের সবারই ছিল কল্পনার অতীত।

আমার তৃতীয় কাকা পুলিশে চাকরি করেন। চাকরির সুবাদে কাকাকে চট্টগ্রামে থাকতে হয়। কাকি বাড়িতে থাকেন। দুই বছরের পিংকি (কাকার মেয়ে) বাড়ির সবাইকে এমনভাবে মাতিয়ে রাখে যে, একটু চোখের আড়াল হলেই সবারই মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। এর মধ্যে কাকির পেটে দ্বিতীয় বাচ্চা এলো।

সামাজিক গোড়ামির কথা চিন্তা করে যদি আবারও মেয়ে হয় তাই ভেবে বা ভয়ে কাকা ও কাকি দুজনই বাচ্চা নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কাকি বাড়িতে থাকায় বাবা, মা, দাদু, ঠাকুরমা এবং পরিবারের সবাই সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে বাচ্চা নষ্ট করতে দেননি।

১৯৯৫ সালের জুন মাস। দিনটি আমার ঠিক মনে নেই। সকালে কাকিকে গ্রামের বাড়ি থেকে বারহাট্টায় নিয়ে আসা হলো। উদ্দেশ্য, হাসপাতালে ভর্তি করানো। বিকাল তিনটা পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পরও সঠিক ডেলিভারি হচ্ছে না বিধায় হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স বললেন, কাকিকে নেত্রকোনা বা ময়মনসিংহ হাসপাতালে নেয়ার জন্য।

সবাই চিন্তা করে দেখলেন যে, ময়মনসিংহ হাসপাতাল নেত্রকোনার চেয়ে অনেক ভালো এবং ময়মনসিংহে প্রচুর আত্মীয়স্বজন আছে। তাই সিদ্ধান্ত হলো ময়মনসিংহে নিয়ে যাওযার। এখন যাওয়া নিয়ে ঘটলো আরেক বিপত্তি। কারণ হাসপাতালের একমাত্র অ্যাম্বুলেন্সটি নষ্ট, থানার ইউএনও-এর গাড়িটিও বাইরে। ফলে বাধ্য হয়েই ট্রেনে যাওয়া লাগবে। এদিকে ট্রেন আসারও পাচ দশ মিনিট দেরি।

তাই আমার আরেক কাকা স্টেশনে গিয়ে স্টেশন মাস্টার ও গার্ডকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিশেষে ভয়ভীতি দেখিয়ে ট্রেনকে আধ ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখলেন। কাকী আসার সঙ্গে সঙ্গেই চার পাচটি সিট খালি করে ভালোভাবে শোয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

কাকির সঙ্গে গেলেন আমার ঠাকুরমা, মা ও মেজ কাকা।

ট্রেন নেত্রকোনা এসে পৌছালো এবং নেত্রকোনা থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেইন শুরু হয়ে গেল ক্রমে এটি বাড়তেই থাকলো।

এদিকে আমার ঠাকুরমা ও মা বাচ্চা প্রসবের ব্যাপারে (ধাত্রী বিদ্যা) খুব ভালো জানেন না। যদিও আমার ঠাকুরমা তেইশটি সন্তানের গর্বিত জননী।

এদিকে আবার আগামী চার পাচটি স্টেশনেও কোনো ভালো হাসপাতাল নেই। তাই এই বিষয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ঠাকুরমাই দায়িত্ব তুলে নিলেন। কম্পার্টমেন্টের অর্ধেক খালি করে, দরজা জানালা বন্ধ করে, কাপড় দিয়ে বেড়া দিয়ে অনেক কষ্টে বাচ্চা প্রসব করানো হলো। এদিক থেকে কাকা, কাকির সৌভাগ্যই বলতে হবে। কারণ শিশু সন্তানটি ছিল ছেলে।

ডাক্তার ও নার্সদের আন্তরিক সেবার ফলে মা ও শিশু সন্তান ভালো হয়ে ওঠে। তারপর তারা নেমে গৌরীপুর হাসপাতালে যায়।

পরে তাদের মুখে শুনতে পেলাম ডাক্তার ও নার্স সবাই ঠাকুরমাকে বলেছেন, আপনি সঠিক সময়ে এই ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

এই বিচিত্রভাবে চলতি অবস্থায় আমার ছোট্ট ভাইটির জন্ম হয়েছে বিধায় ওর নাম রাখা হয়েছে *চলন্ত*।

*বারহাট্টা, নেত্রকোনা থেকে*

# গর্ব

**- ওয়ালিউর রহমান খোরশেদ**

আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গারো পাহাড়ের পাদদেশে। দুর্গাপুর উপজেলার কোনো এক গ্রামে। সেখানে প্রায় লক্ষাধিক আদিবাসীর বসবাস।

ওদের দেখার আমার খুব শখ ছিল। লেখাপড়ার চাপে যাওয়া হয়নি কখনো। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করে একবার ওখানে গেলাম বেশ কয়েকদিন থাকবো বলে।

আত্মীয়টি হচ্ছে আমার দূরসম্পর্কের এক ফুপু। ওনার দুই ছেলে। বড় ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করে, ছোট ছেলে আমার সমবয়সী, তার নাম আনু।

বিকেলে ঘুরে ফিরে সন্ধ্যায় এসে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই রাত শেষ। ঘুম থেকে উঠে বাইরে এলাম। পাহাড় ভেদ করে লাল টুকটুকে সূর্য উঠে আসছে। ঝিরি ঝিরি বাতাসে বসে দেখতে লাগলাম মনোরম দৃশ্যগুলো। আদিবাসীদের পরিশ্রম নিজ চোখে দেখলাম।

বেশ কয়েকদিন থাকলাম। ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। গারো মেয়েদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। আমি নাকি অন্যদের চেয়ে আলাদা।

আদিবাসীরা সহজ সরল মনের অধিকারী। তাই কিছু দুষ্টু প্রকৃতির লোক তাদের সরলতার আঘাত করে পালিয়ে যায়। বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে ভালো মানুষদের বেলায়ও। রূপে, গুণে ওরাও কম না, নজর কাড়ার মতোই। আমি অবগত হলাম তাদের খাবারের প্রতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কাজ-কর্মে, প্রার্থনা-সংস্কৃতিতে।

সুদীর্ঘ দিন পরে আমার মনে ছেদ পড়লো রেশমি সাংমা এক উপজাতির মেয়েকে দেখে। ও দেখতে সোনিয়া, রূপা, মণি, রুবি, নূপুরদের চেয়েও অধিক সুন্দর। আমি ভুলে যাই আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। রেশমি আমার মাঝে একটি দাগ হয়ে পড়লো। ক্রমেই বিশাল রূপও ধারণ করলো।

রেশমি এসএসসি পাস করে নিরাপত্তার অভাবে কলেজে ভর্তি হয়নি। ওর বাবাকে একদিন বললাম, মামা, রেশমিকে নিয়ে আমাদের এখানে একদিন বেড়াতে যাবেন।

পাশ থেকে রেশমি বলে উঠলো, সবাই তো এভাবেই বলে, সঙ্গে না নিয়ে গেলে কি হয়।

ওর বাবাকে বললাম, নিয়ে যাবো?

ওর বাবা বললেন, নিয়ে যাও।

তার কথায় আশ্চর্য হলাম। কারণ এক যুবতী মেয়েকে একটা ছেলের সঙ্গে দিয়ে দিতে রাজি হলো।

মনে মনে গর্ববোধ করলাম আমার পবিত্রতা তাদের কাছে প্রকাশ পাওয়ার জন্য।

এরপর একদিন রেশমিসহ আনুকে নিয়ে চলে এলাম। রাস্তায় সে বাসে উঠে বমি করতে করতে একবারে অস্থির। আগে কখনো বাসে ওঠেনি তাই। আমার ঘাড়ের ওপর মাথা রেখে বমি করছে। তারপর ভাবলাম ওর জন্য বাসে যাওয়া ঠিক হবে না, ট্রেনে যেতে হবে।

সময় মতো ট্রেন স্টেশনে দেখে রাস্তায় নেমে পড়লাম। দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। ভাগ্যক্রমে দুটি সিটও পেয়ে গেলাম।

আনু সিট পেল না। তাই দাড়িয়ে থাকলো।

আমরা দুজন বসে আছি। রেশমি তো ভয়ে অস্থির এতো বড় বড় বাস ট্রেন দেখে। সে কোনোদিন এসব দেখেনি। রেশমির সুন্দর চেহারায় মলিনতার ছাপ পড়লো।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়লো, তখন রেশমি দাড়িয়ে আনুকে বললো, দাদা, আপনি বসেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে। যে ভাবে বললো তাতে আনুর আর দাড়িয়ে থাকতে হলো না।

ভীষণভাবে মুগ্ধ হলাম।

ট্রেনে যে, চাপাচাপি, ভিড় হয় তা রেশমির জানা ছিল না। তার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে মহা কষ্টে দাড়িয়ে আছেন। আর বাচ্চাটির কান্নার শব্দ নীরবতায় বিকট আকার ধারণ করতো। কিন্তু লোকের কোলাহলে ছোট্ট বগিতে সীমিত থাকলো। তার করুণ অবস্থা রেশমি উপলব্ধি করলো। তারপর বাচ্চাটিকে তার কোলে নিয়ে মহিলাকে ভালোভাবে দাড়াতে বললো।

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এই গারো মেয়েটিকে। কি মায়া, কি প্রেম, কি উদারতা! চার ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকলো। কতোবার বসতে বলেছি, বসলো না।

অবশেষে গন্তব্যে পৌছালাম।

মা আমাদের সঙ্গে ওই মেয়েকে দেখে অবাক হলেন। তারপর আনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই মেয়েটি কে রে?

আমার মতো মিথ্যা বানিয়ে বললো, ও কাজিকাকার মেয়ে।

কারণ ওর মাঝে গারোদের ছাপ নেই। তাই মা বিশ্বাস করলেন।

রেশমি মেয়েটি আমার মাকে দুদিনেই জয় করলো।

মা মুগ্ধ হয়ে ওর বাবাকে নিয়ে আসতে বললেন।

মাকে বললাম, মা, ওর বাবাকে তুমি গ্রহণ করবে? ফিরিয়ে দেবে না তো?

মা বললেন, না।

রেশমির বাবাকে নিয়ে এলাম দুদিন পর।

মায়ের সঙ্গে কথা বললেন।

উভয়ের সম্মতিতে আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়। ধর্মীয় বহু গোড়ামির জন্য বিয়ের অনুষ্ঠান করতে পারিনি।

রেশমি প্রথম রাতে আমাকে বললো, একটা কথা রাখবে?

মাথা নাড়িয়ে সায় দিলাম।

ও বললো, আমরা যতো দিন গ্রামের বাড়িতে যাবো ততোদিন ট্রেনে চড়ে যাবো। এছাড়া তোমার কাছে কিছুই চাওয়ার নেই।

আজ আমাদের বিয়ের বয়স তিন বছর। রেশমিকে ইসলাম ধর্মে এনেছি। ওর নাম রেশমি থেকে রৌশনারা রেখেছি। রৌশনের হাসি খুব সুন্দর। তাই বাসের ওই কাহিনী মনে করিয়ে দিলে মুখ টিপে হাসে। আমার মাও তাই ভালোবাসেন।

আমাদের সংসার জুড়ে চাদের মতো ফুটফুটে বাচ্চা এসেছে। সে আমাদের দুজনার গর্ব। আর আমার একার গর্ব রৌশন।

*উত্তর সাতপাই, নেত্রকোনা থেকে*

# হিন্দু নাকি মিঞা

- মাফুজা খানম জলি

তখন রূপসা থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত রেলগাড়ি চলাচল করতো। একদিন রেলগাড়িতে চড়ে বাগেরহাট থেকে ফকিরহাট আসছিলাম। ফকিরহাট আসতে বাগেরহাটের পরে সে স্টেশনটি তার নাম খানজাহান আলী স্টেশন। স্টেশনটি সরকারি পিসি কলেজের খুব কাছে অবস্থিত। গাড়িটি স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই হুইসল দেয়ার নিয়ম। তবুও হুইসল হচ্ছিল স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশি সময় ধরে এবং বিরতিহীনভাবে। আর গাড়ি যতোটা স্লো চালানোর কথা ছিল তারচেয়েও বেশি স্লো চলছিল।

এক সময় হঠাৎ করেই থেমে গেল। গাড়িতে যখন হুইসল চলছিল তখন জানালার পাশের উৎসুক যাত্রীরা কোনো একটি দৃশ্য যেন হুমড়ি খেয়ে দেখছিল।

গাড়ি থামতেই দেখলাম স্টেশন দিয়ে অনেক লোক চেচামেচি করতে করতে ইঞ্জিনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এক সময় ট্রেনের যাত্রীদের মাঝে থেকে বলাবলি করতে শোনা গেল, একজন বৃদ্ধ লোক ট্রেনের নিচে কাটা পড়েছে। লোকটির পরনে ছিল লুঙ্গি আর গায়ে ছিল গেঞ্জি। কেউ কেউ বলছিল, লোকটি আত্মহত্যা করেছে। কারণ দূর থেকে গাড়ি আসতে দেখেও লোকটি রেললাইনের মাঝখানে ঠায় দাড়িয়েছিল।

আবার কারো কারো ধারণা, মস্তিষ্ক বিকৃতি। অবশ্য ভয়ে দৃশ্যটা দেখিনি। গাড়ির ভেতরের যাত্রীরা যখন কাটাপড়া বৃদ্ধটির কথা বলাবলি করছিল আর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুঃখ প্রকাশ করছিল তখন আমার সামনের সিটে বসা এক হিন্দু প্রৌঢ়া যাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি হিন্দু নাকি মিঞা?

উত্তরে একজন বললো, একটি লোকের করুণ মৃত্যু হয়েছে এটাই বড় কথা। তাছাড়া লোকটি *হিন্দু নাকি মিঞা* এটা কি দেখার মানসিকতা এ মুহূর্তে কারো থাকে?

*ফকিরহাট, বাগেরহাট থেকে*

# বিনয়

- সালমা পারভীন খোশনবীশ

ঢাকা কমলাপুর স্টেশন থেকে রায়পুরা যাওয়ার ইচ্ছা। মনে আশা, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবো। এবং রেলগাড়িতে খুব মজা করবো।

বেশি তাড়াহুড়োর মধ্যে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে বসলাম। আমার সঙ্গী আমার স্বামী, ছোট ছোট তিন ছেলে এবং আট মাসের একটি মেয়ে। বাচ্চাদের বাবা তিন ছেলেদের নিয়ে একটু দূরে বসেছে। আমি বসেছি মেয়েকে নিয়ে জানালার পাশে।

গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরম। ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে খুব অস্বস্তির মধ্যে বসে আছি। আমাদের বগির মানুষ ধরার এক চিলতে জায়গাও খালি নেই। এমন পানির তৃষ্ণা পেয়েছে যেন মনে হচ্ছে কারবালা প্রান্তর। এখনকার মতো বোতলজাত পানি তখন রাস্তাঘাটে পাওয়া যেতো না। থানাবাড়ি স্টেশনের কাছে ট্রেন হালকা গতিরোধ করতেই আমার পানির তৃষ্ণা আরো বেশি পেয়ে বসলো।

ট্রেনের দরজার সামনে একটি লোক হলুদ বাহারি রঙের পাঞ্জাবি ও বাহারি লুঙ্গি পরে দাড়িয়ে আছে। লোকটিকে বললাম, বাবাজি, একটু পানি খাওয়াতে পারো?

সে আমার জন্য পানি জোগাড়ের চেষ্টায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে আমাকে এক গ্লাস পানি এনে খাওয়ালো।

খুব শান্তি পেলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ছোট তুলতুলে মেয়েটি আমার কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় আমার গলার মধ্যে একটু টান পড়লো। আমি বুঝে ওঠার আগেই সেই বাহারি রঙের পোশাক পরা লোকটি আমার গলার হারটি নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে।

আমিও ছোট্ট ঘুমন্ত মেয়েটিকে পায়ের নিচে ফেলে ওর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। আমার পাশের কোনো লোকই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না আর আমার স্বামী দূরে বসাতে সেও আমার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। এমন শক্ত করে লোকটির পাঞ্জাবি দুই হাতে ধরে রেখেছি এবং দাত দিয়ে পাঞ্জাবির একাংশ কামড়ে ধরেছি যে, সে কিছুতেই নিজেকে ছোটাতে পারছে না। তার সঙ্গে আমার পুরোদমে ধস্তাধস্তি চলছে।

হঠাৎ মেয়েটি ভয় পেয়ে চিৎকার করে দিল।

লোকটি এই সুযোগ কাজে লাগালো। সে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

অবশ্য হারটি আমার শাড়ির ভাজেই পড়ে ছিল। আমি ওটাকে তুলে নিলাম। চাকরিজীবী স্বামীর টুকটাকের সংসারে ওটাই ছিল আমার শেষ ভরসা।

আমার স্বামী ছিলেন তৎকালীন রায়পুরা উপজেলা প্রধান অফিসার (বর্তমানে TNO সমমর্যাদাপূর্ণ)।

চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। তিন দিন পর উপজেলা ভিডিপি অফিসারসহ আরো অনেকে লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে। সেই একই রঙের পোশাক পরে লোকটি আমার কাছে এসে বলে, আপনি আমার ধর্মের বোন। আপনি বাচালে বাচাতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।

বললাম, ধর্মের বোনের হার ছিনতাই করো, এ তোমার কেমন ধর্মীয় মনোবৃত্তি?

তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। থানা কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিল।

আজকের সমাজে এটা কল্পনাও করা যায় না। আজকের প্রশাসন এবং থানা প্রশাসন অত্যন্ত নিচু পর্যায়ের মানসিকতার পরিচয় বহন করে। পারলে দশ টাকা খেয়ে ছিনতাইকারীকে ছেড়ে দেয়।

আজ থেকে বাইশ বছর আগে যে বাংলাদেশে বাস করতাম, বাইশ বছর পর সেই একই বাংলাদেশে বাস করছি। এখন দেখুন তফাতটা।

বাহারি রঙের পোশাক পরা লোকটি অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে মাফ চেয়ে বিদায় হলো। আমিও তাকে মাফ করে দিই।

একজন তৃষ্ণার্ত মহিলাকে সে খুব কষ্ট করে পানি পান করিয়েছিল। আজো সেই ছিনতাইকারীকে ভুলতে পারি না। কতোটাই না বিনয় বোধ ছিল তখনকার দিনের ছিনতাইকারীর!

*ধোলাইপাড়, ঢাকা থেকে*

## ওঠো বহিন

**- মহসীন**

বাড়ির পাশ দিয়েই ট্রেনলাইন ছিল আর ছোট খালা এবং বড় বোনের বাড়ি যেতে হলে ট্রেন ছাড়া গতি ছিল না। ফলে ছোটবেলা থেকেই ট্রেন ভ্রমণ একটা সুখস্মৃতি হিসেবেই মনে জায়গা করে নিয়েছিল।

কিন্তু এই স্মৃতিকে একটা বিশেষ মাত্রা এনে দেয় ১৯৯৭ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ ইনডিয়ায় সপরিবারে ট্রেন ভ্রমণের সময়।

সে বছর আমি, আমার স্ত্রী আর ওর দুই ভাইকে নিয়ে তাজমহল দেখবো বলে প্রথমে কলকাতায় গেলাম। সেখান থেকে এক দালালের মাধ্যমে কলকাতা টু দিল্লি *কালকা মেল*–এর চারটা টিকেট কিনলাম। কিন্তু রিজার্ভেশন মিললো না।

দালাল সান্ত্বনা দিল, এক্সট্রা বগি দেবে। ফলে আপনারা বসে যেতে পারবেন।

নির্দিষ্ট দিন হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়ে দেখলাম তিনটা এক্সট্রা বগি দেয়া হয়েছে। আমরা তার একটাতে উঠলাম। কিন্তু দেখলাম সব সিট কুলিরা দখল করে রেখেছে।

কি আর করা! এক কুলিকে একশ রুপি দিয়ে একটা বেঞ্চ দখল করলাম।

এক সময় দেখলাম স্রোতের মতো মানুষ উঠছে। অবশেষে আমাদের ওই বেঞ্চে প্রায় আটজন বসলো। এর মধ্যে একজন শিক্ষিত যুবক আমাদের টিকেট দেখে বললো, আপনাদের টিকেট তো ননএসি স্লিপারের। কাজেই আপনারা এখানে কষ্ট না করে টিকেটে আপনাদের জন্য যে বগি বরাদ্দ আছে সেখানে চলে যান।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ফলে অপেক্ষা করতে হলো। যখন আসানসোল এলো তখন চারজন ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সবাই এমন একটা দৌড় দিলাম যে, তা কার্ল লুইসকেও হার মানাবে।

অবশেষে ওই বগিতে উঠে অ্যাটেনডেন্টকে কিছু টাকা দিয়ে ওনার সিটটা আমার স্ত্রীর জন্য দখল করলাম, বাকিরা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করে সারা দিন বেশ আনন্দেই দুই পাশের পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখলাম।

বিপত্তি হলো রাতে। রাত নয়টার দিকে যে সমস্ত যাত্রীর রিজার্ভেশন ছিল তারা আমাদের তুলে দিয়ে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

আমরা আর কি করবো! অবশেষে দরজার সামনে যে খালি জায়গা থাকে সেখানে চাদর বিছিয়ে চারজন শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরেই চারজন পুলিশ এসে কিসব বস্তা রাখতে লাগলো আর আমার স্ত্রীকে বার বার ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো, *ওঠো বহিন, ওঠো*।

আজো আমার শ্যালক আমার স্ত্রীকে দেখলেই বলে, *ওঠো বহিন, ওঠো*।

আর ও হেসে ফেলে।

এর প্রায় তিন বছর পর অফিসের কাজে মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে বাসে কলকাতা পৌছে নির্দিষ্ট হোটেলে উঠলাম।

রাতে একটা কেমিকাল কম্পানির লোকাল এজেন্ট আমাকে আপডাউন দুটো এসি স্লিপার কোচের টিকেট দিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ওনার গাড়িতে চড়েই হাওড়া স্টেশনে গেলাম। যখন *করমণ্ডল এক্সপ্রেস*–এর নির্দিষ্ট বগিতে উঠলাম তখন মনটা ভরে গেল। প্রত্যেকের জন্য একটা বেড, দুটো চাদর, বালিশ, কম্বল, তোয়ালে বরাদ্দ আছে সর্বোপরি সাউন্ডপ্রুফ এসি রুম দেখে খুব ভালো লাগলো। দীর্ঘ আটাশ ঘণ্টা কিছু শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে একটা আনন্দময় ভ্রমণ সমাপ্ত করলাম।

সবশেষে গত বছর মে মাসে ইংল্যান্ডে ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হলো। ইয়র্কশায়ার থেকে ট্রেনে লন্ডন যাওয়ার সময় দেখলাম শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতা কাকে বলে! মেকানিকাল কোনো সমস্যার কারণে শেফিল্ডে ট্রেন দশ মিনিট আটকে ছিল। এই দশ মিনিটে ড্রাইভার পাচবার মাফ চেয়েছে এবং পরবর্তী প্রতিটি স্টেশনে জানিয়ে দিয়েছে যে, ট্রেন দশ মিনিট লেট হবে।

লন্ডনে *কিংস ক্রস* স্টেশনে আমার ছোট ভাই অপেক্ষা করছিল। আমি নামার সঙ্গে সঙ্গে সে বললো, ভাইয়া, আপনার যে দশ মিনিট লেট হবে তা আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

*হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে*

# হারানোর পরে

- অনু

ট্রেন ভ্রমণ নিয়ে লিখতে বসে স্মৃতির তলা হাতড়ে পেলাম কিছু দীর্ঘশ্বাস। আমার বাবা কলেজ শিক্ষক। ১৯৯৯-এ আব্বুর কাছে পড়তে আসা ছাত্রদের মধ্যে একজনকে আলাদা চোখে পড়লো। নাম নিঝুম। পরোক্ষভাবে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

সে আমার আগ্রহটা বুঝলো।

তার চোখের ভাষাটা ঠিক বুঝতাম না।

আমাকে সাহায্য করতো এক কাজিন।

নিঝুম তাকে ডেকে আমার উদ্দেশ্যে কিছু অপমানজনক কথা বললো।

আমি একরোখা টাইপের মেয়ে। পুরোপুরি গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। ওকে দেখলেই ওর কথাগুলো আমাকে দংশন করতো।

রোজ দুপুরে পড়তে আসতো সে। এক সময় দেখি ও কথা বলতে চেষ্টা করছে, কাজিনকেও পাঠিয়েছে।

পাত্তা দিলাম না প্রথমে। পরে বুঝলাম সেও আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। জেদ চেপে গেল আমার। প্রতিজ্ঞা করলাম, আত্মার কষ্টটাকে তার মধ্যে ছড়িয়ে দেবো।

যেহেতু ও প্রতিদিনই বাসায় আসতো, ওর সঙ্গে হালকা প্রেমের গভীর অভিনয় করতে অসুবিধা হলো না।

বলে রাখা ভালো, আমার দাদাবাড়ি নাটোর। নিঝুমদের বাড়িও নাটোর। ওরা দুই ভাই রাজশাহী এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে। মেসে থাকে।

বছর খানেক চেষ্টা করে যখন পাগল বানিয়ে ফেলেছি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে জানানোর। নিঝুমের এক ফ্রেন্ড এবং আমার কাজিনের মাধ্যমে জানালাম সব ভুলে যাও, আমি তোমার না।

ও এতোটা আহত হলো যে, প্রায় ছয় মাস আর বাসায় এলো না। শুধু বন্ধুদের মুখে শুনতাম, খুব ভেঙে পড়েছে।

নিজেকে জয়ী মনে হলো, মহিলা বীর মনে হলো।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শুরু হবার কয়েকদিন আগে নিঝুম বাসায় এলো।

সেদিন আব্বু-আম্মু বাসায় নেই, আমি একা। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। খুব অনুরোধ করা স্বত্ত্বেও দরজা খুললাম না। লোহার গৃল দেয়া দরজার ওপাশে নিঝুম এবং এপাশে আমি। আমার চোখের ভেতরে তাকালো সে। মিনতি করে বললো, বুকের ভেতরটা তো তুমি দেখতে পাচ্ছো না। তাই বোঝাতে পারবো না এখানে কতো কষ্ট! পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় চলে যাচ্ছি।

বললাম, জেদে পড়ে অভিনয় করেছি। আসলে কখনোই ভালোবাসিনি। আমাকে ক্ষমা করো।

সে বললো, ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায়?

বললাম, তবে কি পা ধরবো?

বললো, না।

তবে?

নিঝুম ঠোট কামড়ে বললো, সেটা সময়ই বলে দেবে।

সিড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল নিঝুম।

খেয়াল করলাম কাপছি। আর কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না। ক্লান্ত লাগছিল। মাস খানেক পরে শুনলাম নিঝুম ঢাকায় চলে গেছে কোচিংয়ের জন্য। ওখানে ভর্তি হবে।

তখন মনে হলো আমার বুকের মধ্যে একটা আকাশ তৈরি হলো, একটুও কান্না আসেনি। চেষ্টা করলাম কাদতে। মনে হচ্ছিল কাদলে ভালো লাগবে। কিন্তু হলো না।

এভাবে কয়েকদিন গেল। একদিন দুপুরে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে আছি। তখন ছাত্রদের পড়তে আসার সময়। ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম দরজায় নক হচ্ছে। লাফিয়ে উঠলাম। মনে হলো নিঝুম এসেছে। দৌড়ে বারান্দায় গেলাম। দেখি অন্য একজন। ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। মনে হলো মারা যাচ্ছি। মনে হলো পৃথিবীটা নষ্ট।

তবু কাদতে পারিনি। দিন রাত কেবলই মনে হতো খুব প্রিয় কি যেন হারিয়ে গেছে। কিছু একটা নেই আমার। খুজে পাচ্ছি না যেন। কোথায় যেন ফেলে এসেছি ভুলে। কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সেই থেকে তাকে খোজা শুরু আমার। রাস্তার পাশে খুজি, ট্রাফিক জ্যামে খুজি, মনিচত্বরে ছেলেদের আড্ডায়, ফাস্ট ফুডে, পদ্মার ধারে, বাসস্ট্যান্ডে, পার্কে, কনসার্টে সবখানে। বাইরে বেরোলেই মনটা সতর্ক হয়ে থাকে, পিপাসার্ত হয়ে থাকে তাকে এক নজর দেখার জন্য। নিজেকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারি না, সে নেই। বিশ্বাস করতে পারি না সে চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। ভাবতে পারি না সে হারিয়ে গেছে। এখানেই তো ছিল। এখানে আড্ডা দিতো। পদ্মায় বেড়াতে যেতো, এই ফাস্ট ফুডে খেতে আসতো, অথচ এতোগুলো জায়গার কোথাও সে নেই। যার পরে আর হারানোর কিছু থাকে না। ওহ বুকটা ভেঙে যেতে থাকে। কিন্তু কাদতে পারি না। কষ্টগুলো জমাট বেধে থাকে শ্বাসযন্ত্রের পাশে। তরল হয় না।

কোনো এক বৃহস্পতিবারে তার রেজাল্ট হলো। বুঝলাম সে রাজশাহী এসেছে। সারা দিন অপেক্ষা করলাম এবং ব্যথার বেদীমূলে আরো একবার পড়লাম। সে এলো না। কাদতে পারিনি তবুও।

পরদিন ভোরে আব্বুর সঙ্গে দাদাবাড়ি যাচ্ছি নাটোর। সবার আগে পৌছায় *তিতুমীর ট্রেন।* রাজশাহী–নাটোরের যাত্রীদের সবচেয়ে পছন্দের বাহন। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ট্রেন ছুটে চলেছে। এক গলা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছি ট্রেনে, পাশে আব্বু। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করছি, সে এই ট্রেনে আছে। কারণ রেজাল্ট নিয়ে আজ সে অবশ্যই বাড়ি যাচ্ছে। আমার গলা শুকিয়ে আসছে, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। যেকোনো মুহূর্তে সামনে আসতে পারে নিঝুম। কারণ আব্বু তার শিক্ষক।

প্রকৃতিকে পেছনে ফেলে ছুটে যাচ্ছি আমরা। বৃষ্টির ছাট মুখে এসে লাগছে। বড় কান্না পাচ্ছে আমার। আজ কাদলাম না ইচ্ছা করেই। জমা করে রাখলাম তার জন্য। বিলের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। বিলের ওপারে কৃষ্ণচূড়ার সারি, বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ।

ট্রেন গন্তব্যে এসে থামলো। স্টেশন থেকে বেরোনোর সিড়িতে তাকে দেখতে পেলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে তাকালো আমার দিকে।

আমার চোখে রাজ্যের আকুতি। আজ সে আমার চোখের ভাষা ঠিকই বুঝলো। প্রশ্রয় দিল না।

আব্বুকে সালাম দিয়ে শেষবারের মতো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল নিঝুম।

আর আমি?

থাক, আর কাজ কি?

*কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে*

## ট্রেনপ্রীতি

**- নাজু**

আমাদের বাসা থেকে ষাট সত্তর গজ দূরেই ছিল ঢাকা–চট্টগ্রাম রেললাইন। এই পথে সারা দিন কতো ট্রেনই না গুম গুম শব্দ তুলে ছুটে যেতো তার হিসাব নেই। ট্রেনের হুইসলের শব্দ কানে গেলেই ঘরে মাঠে যেখানেই থাকতাম, ছুটে এসে পুকুর পাড়ে দাড়াতাম। নিমেষেই ট্রেনটি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতো। অজানা আনন্দ

আর খুশিতে মনটা ভরে যেতো। ট্রেনের যাত্রীদের হাত নেড়ে বিদায় জানাতাম। মনে কতো প্রশ্নই না ভিড় জমতো! ছোট ছিলাম, সাহস করে কাউকে কিছু বলে জানতে চাইতাম না।

বিকেলে মাঠে খেলতে গেলে পাশের রেললাইনে চলে যেতাম। রেললাইনের স্লিপারগুলো গুনতে গুনতে অনেক দূর চলে যেতাম খেলার সঙ্গীরাসহ। ছোট ছিলাম বলে সেগুলোর দূরত্ব লাফিয়ে পার হতাম। রেললাইনের পাথর ঘেটে খুজে বের করতাম ভিন্ন রঙের পাথর। সেটা যদি শাদা কিংবা ব্রাউন হতো তাহলে তো কথাই নেই। ছোট্ট বুকটা খুশিতে নেচে উঠতো।

এই পাথরগুলো নিয়ে স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে মেঝেতে বসে খেলতাম। পাচটা পাথর দিয়ে খেলা। অন্য বান্ধবীরাও পাথর নিয়ে আসতো। কিন্তু আমারগুলো ছিল স্পেশাল, নজরকাড়া। তারা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতো। কেউ বা ছুয়েও দেখতো।

আমার মনটা গর্বে ভরে যেতো।

আব্বা ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে তিনি চার দিন চট্টগ্রাম, বাকি তিন দিন ফেনীতে থাকতেন। ফেনীতে আমাদের বাসা এবং আব্বার ব্যবসাস্থল। আব্বা প্রতি বৃহস্পতিবার *বাহাদুরাবাদ* মেইল ট্রেনে আসতেন সন্ধ্যার সময়। এদিনটির জন্য আমরা ভাই-বোনরা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আব্বা চট্টগ্রাম থেকে মৌসুমি ফল, কেক, পেস্ট্রি, চকলেট, চানাচুর, বিস্কিট, মোরব্বাসহ অনেক খাবার নিয়ে আসতেন। আমরা তিন দিনেই সব সাবাড় করে পেলতাম।

আব্বা ছিলেন ছোটখাটো মানুষ। স্টেশন থেকে রিকশা করে আসার সময় প্যাকেট আর বাক্স এবং থলের আড়ালে ওনাকে দেখা যেতো না।

মনে পড়ে তখন সম্ভবত ক্লাস ফাইভ কিংবা সিক্সে পড়ি। আব্বা সব সময় বুফেতে চড়তেন। খেতে খেতে আসতেন। আমাকেও চিটাগাং নিয়ে গেলেন বুফেতে। সেই প্রথম কাটলেট খেলাম। আব্বা সারা পথ আমাকে শুধু খাবার সেধেছিলেন। সে সময় ট্রেনের নাম ছিল *উল্কা, গ্রীন এ্যারো*। উল্কা খুব জোরে চলতো। সময়টা ছিল ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর সময়কাল।

১৯৭১ সাল। আমার তখন ষোল বছর বয়স। কাকতালীয়ভাবে আমাদের গ্রামের বাড়িও রেললাইনের পাশেই ছিল। পাক আর্মিরা ট্রলি দিয়ে রেলপথে যাওয়া-আসা করতো। মাঝে মধ্যে ওরা ট্রলি থামিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে নামতো পানি খাবার জন্য।

তখন তাড়াতাড়ি পুরুষরা সবাই এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতো। পানি খাওয়াতো।

আমরা মেয়েরা তাদের ইশারায় বিলের পাড়ে বনের ভেতর লুকিয়ে যেতাম।

ওরা বেশ কিছুক্ষণ থেকে আবার ট্রলিতে চেপে ঠক ঠক শব্দ তুলে চলে যেতো।

আমরা হাপ ছেড়ে বাচতাম। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেতো।

১৯৮০ সালের জুন মাস। আব্বা আগের বছর মারা গিয়েছেন। আম্মা, মামা, আমার ছোট দুই ভাই ও আমি আজমীর যাচ্ছি জিয়ারতের জন্য।

আমরা কলকাতা থেকে *কালকা মেইল*-এ যাচ্ছি। ইলেকট্রিক ট্রেন। খুব দ্রুত গতিতে চলে। কৌতূহল বশত হাতটা একটু বের করলাম। ঝা করে উঠলো যেন হাতটা ছিড়ে নিয়ে যাবে। ট্রেনে মুখোমুখি দুইটা লম্বা সিট। আটজন বসা যায়। আমরা পাচজন ছাড়াও আছে তিনটি ছেলে। একজন জার্মানিতে থেকে এসেছে ইনডিয়া ভ্রমণে। বয়স বাইশ তেইশ হবে। কিছুক্ষণ পর পরই বিভিন্ন ফেরিওয়ালা নানান খাবার নিয়ে হাজির হচ্ছে। বিস্কিট, বাদাম, চকলেট, ফল, মিষ্টি, চুইংগাম, চা আরো অনেক কিছু। আমরা দুই একটা আইটেম কিনে খাচ্ছি।

লক্ষ্য করলাম, বিদেশি ছেলেটি কাউকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে না, সবই খাচ্ছে। চুপচাপ দেখছি আর মিটি মিটি হাসছি। হঠাৎ দেখি একটা ফেরিওয়ালা ভর্তা জাতীয় কিছু বিক্রি করছে। লবণ মরিচ গুড়ো দিয়ে মাখানো।

আমড়া, কামরাঙা জাতীয় কিছু হবে। ছেলেটি তা কিনে খেতে শুরু করলো। হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। মুখে আচল চেপে হাসতে হাসতে আমার দম বন্ধ হবার অবস্থা।

আম্মা কনুই দিয়ে পেটে খোচা দিলেন হাসি বন্ধ করার জন্য।

হাসি থামাতে পারছি না। মামার দিকে চোখ পড়লো।

তিনি চোখে রাগ নিয়ে তাকালেন।

ছোট ভাইও চোখ গরম করে রাগত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে।

বাইরে তাকিয়ে হাসি থামানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি। সে এক বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতি। ছেলেটি দুপুরের লাঞ্চ এবং রাতের ডিনারও গাড়িতেই খেয়েছিল।

এবার আসি ১৯৮৮ সালের একটি ঘটনায়। আমার স্বামীর সঙ্গে ছোট দুটি কন্যাসহ ট্রেনে ঢাকা যাচ্ছি মাইজদী থেকে। তিনি সেখানে একটি বিদেশি ফার্মে কর্মরত। ছোট মেয়েটির সব সময় পেট খারাপ থাকে। তাই ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। এবার ফেরার পালা। ছোটটি ন্যাপকিন ভিজিয়ে ফেলেছে। ফলে চেঞ্জ করার জন্য তাকে প্যান্টি খুলে বাবার কোলে দিলাম আবার পরাবো বলে। চলন্ত ট্রেনে তিনি মেয়েকে কোলে নিয়ে দাড়ানো। অমনি আট মাস বয়সের বাচ্চাটা তার বাবার শার্ট–প্যান্ট, ট্রেনের সিট, মেঝে সব ভরিয়ে একাকার। তখনো তার পেট খারাপই ছিল।

আমার মাথা ঘুরে গেল, কিভাবে পরিষ্কার করবো! তিনি পেপার কিনেছিলেন ট্রেনে সময় কাটানোর জন্য। সেটা ফ্লোরে বিছিয়ে মেয়েকে দাড় করালাম। তার বাবা কাপড় চেঞ্জ করে মেয়েকে ধরলো। আমি ওর কাথা ভিজিয়ে এনে টয়লেট থেকে ওকে পরিষ্কার করলাম। তারপর প্যান্টি পরিয়ে দিলাম। তিনি ঢাকায় নিজের জন্য আন্ডার গার্মেন্টস কিনেছিলেন। পুরানোগুলো দিয়ে মেঝে, সিট সব পরিষ্কার করে জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম। সে জন্য বার বার চলন্ত ট্রেনে বাথরুমে যেতে হয়েছিল। দ্রুতগতির চলন্ত ট্রেনে হাটা দুঃসাধ্য। আমি হাপাচ্ছিলাম।

ঢাকা আসা–যাওয়ার জন্য রিজার্ভেশন–এর টিকেট কেটেছিলেন বলে ওনার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার বুঝলে তো কেন রিজার্ভেশন নিয়েছিলাম। আজ যদি সেকেন্ড ক্লাসে চড়তে তাহলে মানসম্মান খোয়াতে হতো, যাত্রীদেরও গালি খেতে।

আমার সেই মেয়েটির বয়স এখন সতেরো। ওকে সেদিনের কথা বললে হাসতে হাসতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে আমিও।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

# সম্মান

**- মোহাম্মদ আবু জাবেদ রুবেল**

পেশায় আমি একজন গার্মেন্টস মার্চেন্ডাইজার। পেশাগত কারণে বিগত ছয় বছরে শতাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছে। সেসব দেশ হচ্ছে হংকং, চায়না, তাইওয়ান, মেকাউ, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর ও লন্ডন।

দেশে এ পর্যন্ত তিন চারবারের বেশি ট্রেন চড়া হয়নি। অথচ বিদেশে সর্বত্রই ট্রেন ভ্রমণে আমি অভ্যস্ত। কারণ সেসব দেশে ট্রেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মাধ্যম।

ভ্রমণের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ বা স্বদেশের যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। ভালোই লাগে ভিন্ন জাত, ধর্ম, বর্ণের লোকদের সঙ্গে পরিচিত হতে।

হংকংয়ে তিন ধরনের ট্রেন রয়েছে যা MTR, KCR ও AIRPORT EXPRESS নামে পরিচিত। প্রতিদিন লক্ষাধিক যাত্রী এসব ট্রেন ব্যবহার করছে। এই ট্রেনগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে থামছে।

দিন দিন এসব ট্রেনস্টেশন বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। কখনো ট্রেনগুলো পাতালে ও স্থলে চলছে। এমনকি নদীর তলদেশ দিয়ে ট্রেনপথ নির্মিত হচ্ছে।

ট্রেনের ভেতর খাদ্য–পানীয় বা ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রতিটি স্টেশনে বেশ কয়েকটি EXIT আছে যেগুলো বিভিন্ন এলাকা বা সুপারমার্কেট কিংবা হোটেল নির্দেশ করছে। ট্রেনের ভাড়া দুইভাবে পে করা যায়। *এক.* অক্টোপাস কার্ডের মাধ্যমে যা বিশেষ করে বানানো হয়েছে যাতে Value আগে থেকে যোগ করা থাকে। Value শেষ হলে আবারও Add করা যায়। *দুই.* স্টেশনে টিকেট কাটার মাধ্যমে যা গ্রহণ করতে হয় অটো মেশিন থেকে কিংবা যাত্রীসেবা কাউন্টার থেকে।

আমাদের দেশের মতো বিদেশেও অনেক সময় বয়স্কদের সম্মান করে সিট ছেড়ে দেয়া হয়। এ ধরনের বহু উদাহরণ পেয়েছি। উল্লেখ করার মতো ছোট দুটি ঘটনা বলি।

একবার হংকংয়ের MTR–এ যাচ্ছি অন্য একটি স্টেশনে। বসে আছি, পাশে এক মহিলা ও তার পাশে মহিলার চার বছরের (আনুমানিক) শিশু। একটু পর পয়ষট্টি কি সত্তর বছরের এক ইংরেজ বৃদ্ধ ট্রেনে উঠলেন। আমি সিট ছাড়ার আগেই ওই শিশু দাড়িয়ে বৃদ্ধকে বসার জন্য জোর করতে লাগলো।

বৃদ্ধ বেচারা যতোই বলেন, তুমি বসো, বাচ্চাটা নাছোড়বান্দা।

অবশেষে বাচ্চার মা ইংরেজিতে বললেন, তুমি কি আমার বাচ্চার এই সম্মান জানানোকে গ্রহণ করবে না?

বৃদ্ধ লোকটি হেসে বসে গেলেন।

একইভাবে গত জানুয়ারিতে লন্ডনে Underground বা পাতাল ট্রেনে যাচ্ছি, সঙ্গে মামাতো ভাই রনো ও তার ফ্ল্যাটমেট বাবুভাইকে নিয়ে। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধা ট্রেনে উঠলে বাবুভাই তার সিট ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে বসতে বললেন।

কিন্তু তিনি আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে বললেন, *তোমার অফারের জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রয়োজন নেই। আমি এখনো সমর্থ আছি। কিন্তু আমি গডের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, কেউ না কেউ তোমাকে একইভাবে অফার করবে* (Thanks for your offer, I do not need it. I am still strong. But I will pray to God, when you will be old, someone will offer you in the same way.)।

*কুয়াইশ, হাটহাজারি থেকে*

# গিটার

**- খালিদ আজাদ রাজু**

বিস্তর গবেষণার পর অমিত আবিষ্কার করলো, কোনো ছেলের হাতে গিটার দেখলে মেয়েরা সহজে ইমপ্রেসড হয়। গিটার যে রোমান্টিক আবহাওয়া তৈরি করে তাতে এমন পূর্বাভাস দেয়াই যায়, দুই চারজনকে প্রেমের ফাদে ফেলবার স্বাদ অনায়াসে পূর্ণ হলেও হতে পারে।

তাই যেভাবেই হোক, একটি গিটার কেনা চাই, বিশেষ করে অমিতের নতুন প্রতিবেশিনীর মন জয়ের জন্য। একটি গিটার অমিতের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার এ মতোবাদ কতোটা ফলদায়ক তা পরখ করার সুযোগ না হলেও এটা বুঝতে পারছিলাম যে, এ পদ্ধতিতে গিটার প্রাপ্তির চেয়ে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপ্তি বাড়বে।

শেখার আগ্রহ নিয়ে যদি অমিত গিটার কিনতো তবে তাতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু নিছক মহিলা অঙ্গনে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এক গাদা টাকা খরচ করে গিটার কেনা কোনো সুবুদ্ধির পরিচয় বহন করে না। তাই প্রথমেই আমার আপত্তির কথা অমিতকে জানালাম এবং এ থেকে কি কি বিপত্তি হতে পারে সে সম্পর্কে তাকে বললাম। তবে মুশকিল হলো, অমিত একবার যা করবে বলে ঠিক করে তা করেই ছাড়ে। ফলে এক দুপুরে গিটার কেনার অভিপ্রায়ে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এরপর গিটার কিনে, শহর ঘুরে রাত সাড়ে আটায় বাড়ির উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলাম।

এরই মধ্যে অমিত বেশ কায়দা করে গিটার ধরা শিখে ফেলেছে। দেখলে মনে হয় সে আঙুলের স্পর্শ ছাড়াই গিটারে সুমধুর সুর তুলতে পারবে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কবার সে গিটারে সুর তোলার চেষ্টা করেছে প্রত্যেকবারই এমন বিকট আওয়াজ বের হয়েছে, আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এমন বেসুরো আওয়াজ গিটার থেকে বের হতে পারে।

তবুও অমিত এমন ভাব ধরলো যেন সে বড় কোনো শিল্পী।

যাই হোক। আমাদের ট্রেন যখন নোয়াপাড়া স্টেশনে থামলো তখন আমাদের কম্পার্টমেন্টে দুজন লোক উঠলো। তারা আমাদের সামনের খালি সিটটাতে বসলো। এ দুজনকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম লোক দুটো মাতাল। তাই একটু বিরক্ত হলাম।

পরক্ষণে ভয়ে শক্ত হয়ে গেলাম যখন অমিতের কাছে শুনলাম এদের মধ্যে মোটা যে লোকটা বসে আছে সে আমাদের শহরের বিখ্যাত মাস্তান টৃগার বাবুল।

এরপর মোটামুটি একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো যার জন্য আমি, বিশেষ করে অমিত মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকার পর টৃগার বাবুল যখন চোখ তুলে তাকালো তখন সে তার সামনে বসে থাকা অমিত এবং তার গিটারটাকে দেখতে পেল।

এরপর সে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলো, তোর হাতে গিটার, তার মানে আপনি শিল্পী, আপনি মহান, আপনাকে আজ গাইতে হবে, গান না গাওয়া পর্যন্ত তোর নিস্তার নেই।

তার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ অমিত গানের ‘গ’ জানতো না। তাই ভয়টাকে চাপা দিয়ে হেসে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম মাতালের মাতলামি হয়তো অন্য কোনো দিকে মোড় নেবে।

কিন্তু বিধি বাম।

গান গাইছে না দেখে টৃগার বাবুল হুঙ্কার দিয়ে বললো, গান গাচ্ছিস না কেন শুয়োরের বাচ্চা, আজ যদি তোর গান না ভালো হয় তবে তোর খবর আছে।

হায় হায়, একি বিপদে পড়া গেল! এ আপদ কোত্থেকে এসে জুটলো। তার হুঙ্কার কম্পার্টমেন্টের অন্যান্য যাত্রীদের উৎসাহিত করে তুললো। তারা মাতালের মাতলামি বন্ধ করার চেষ্টা না করে অমিতকে গাইতে অনুরোধ করলো।

এতে সন্দেহ নেই যে, অমিত যদি গান না ধরে তাহলে আমাদের আজ হাসপাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

সমস্যা হচ্ছে, যে নিজেকে শিল্পী হিসেবে সবার সামনে এতোক্ষণ জাহির করার চেষ্টা করেছে সে এখন কিভাবে বলবে গাইতে পারে না।

তাই অমিত কাপা কাপা গলায় বললো, আজ আমার গলা খারাপ।

এ কথা শুনে টৃগার বাবুল হুঙ্কার দিয়ে বললো, ওসব ভালো-খারাপ বুঝি না, আপনি শিল্পী, আপনি মহান, আজ তোকে গান গাইতেই হবে।

কিন্তু অমিত কি গাইবে তা আমি যেমন জানতাম না তেমনি সেও জানতো না।

এভাবে সময় ক্ষেপনে টৃগার বাবুলের ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল।

সে আবারও হুঙ্কার দিয়ে বললো, গান গা শুয়োরের বাচ্চা, না হলে একটা বিচি তোর মাথায় ঢুকিয়ে দেবো।

বলেই সে রিভলভার বের করে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

যাত্রীদের মাঝে চাপা আতংক এবং গুঞ্জন উঠলো।

কিন্তু আমাদের সাহায্যের জন্য কেউ সাহস করে এগিয়ে এলো না।

তার সঙ্গীটি অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

কোনো লাভ হলো না।

টৃগার বাবুল অমিতের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বললো, ও শিল্পী, ও মহান। ওই হারামজাদাকে আজ গাইতেই হবে।

অগত্যা গিটার বিকট আওয়াজ তুলে বাজখাই গলায় ভয়ার্ত কণ্ঠে অমিত গান ধরলো *গাড়ি চলে না, চলে না, চল না রে, গাড়ি চলে না*।

কয়েকবার এ একই লাইন সে ঘুরে-ফিরে গাইলো। কারণ পরবর্তী লাইন সে জানতো না। কিন্তু তাকে বেশিক্ষণ গাইতে হলো না। এর মধ্যেই টৃগার বাবুল জ্ঞান হারালো।

টৃগার বাবুল মাতাল ছিল বলে, নাকি অমিতের গান শুনে জ্ঞান হারিয়ে ছিল এ বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার না হলেও গিটার হাতে কখনো জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এটা অমিত ঠিকই বুঝেছিল।

*বিশেষ দ্রষ্টব্য :* ঘটনার একদিন পর স্থানীয় পত্রিকার শিরোনাম ছিল বোধহয় এ রকম – *ট্রেনে ডাকাতির চেষ্টাকালে অস্ত্রসহ টৃগার বাবুল ও তার সঙ্গী গ্রেফতার*।

khalidazadraju@yahoo.com

# বন্দী ও মুক্তি

কে এ হাবীব

প্রায় দুই মাস যাবৎ কারাগারে বন্দী। জামিন হবে হবে করেও হচ্ছে না। কারণ বাদী একজন প্রবীণ আইনজীবী। আর মামলাটাও তার কন্যাকে নিয়েই। ১৯৯৫ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার অনানুষ্ঠানিকভাবে আমার মামার বাসায় বিয়েটা সম্পন্ন হয়। ওর বাবা-মা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেনি।

আমি পড়তাম স্নাতক ক্লাসে। আর ও ইডেনে অনার্স। যদিও আমাদের ইচ্ছা ছিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করার। কিন্তু পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাড়ালো যে, বিয়ে না করে অন্য কোনো উপায় ছিল না। কেউ কাউকে হারাতে রাজি ছিলাম না মোটেও। গভীর প্রেম যাকে বলে তারচেয়েও যেন বেশি ছিল আমাদের ভালোবাসা। আমার অবস্থা নব্য মজনুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। উভয়ের পারিবারিক ব্যবধান ছিল বেশি। ওরা ছিল ধনী আর আমরা ছিলাম গরিব। এটাই ছিল আমাদের মিলনের সবচেয়ে বড় বাধা।

বিয়ের পর সারাক্ষণ ভয়ে আমরা সন্ত্রস্ত। কখন যেন পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কন্যা যেহেতু উকিলের, তাই ভয় ছিল আরো বেশি।

গোপনে রাত কাটালাম আমার খালার বাসায়। এটাই আমাদের পরস্পরকে পরমভাবে কাছে পাওয়ার প্রথম রাত। এর আগে তিন বছরের প্রেম জীবনে আমরা পরস্পরকে গভীরভাবে ছুইনি। তাই আকর্ষণ ছিল তীব্র। কিন্তু নিয়তির পরিহাস। কতো বড় বিরহ অপেক্ষা করছিল তা আমরা আচ করতে পারিনি।

পরদিন আমার মেজআপা ও দুলাভাই আমাদের নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। হাজারো রঙিন স্বপ্ন দেখছি আর গাড়িতে যাচ্ছি। সারা রাত তো ঘুম হয়নি, ঢুলু ঢুলু নয়নে যখন বিকেলবেলায় নজিপুর পৌছালাম তখন পুলিশ আমাদের গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল।

থানা থেকে ওর উকিল বাবা এবং মাস্তান টাইপের আত্মীয়স্বজন অনেক চেষ্টা করেও আমার প্রিয়তমাকে নিয়ে যেতে পারলো না। ফলে থানাহাজতে মশার প্রচণ্ড কামড়ে নির্ঘুম রাত পার করতে হলো।

পরদিন কোর্টে চালান। প্রথমে ৫৪ ধারা এরপর নারী নির্যাতন মামলা। এছাড়াও উকিলের যতো রকম প্যাচ থাকতে পারে তার সবকিছুই প্রয়োগ হলো আমাদের প্রতি। আমরা ছিলাম দুর্বল। আমার বাবা এবং ভায়েরাও আসামি হলেন। আমি এবং দুলাভাই এক সঙ্গে আর আমার নববিবাহিতা স্ত্রী ও মেজআপা মহিলা ওয়ার্ডে বন্দী।

বাদী আমার স্ত্রীকে তাদের হেফাজতে জামিনে নিয়েছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী ওর বাবার হেফাজতে যেতে অস্বীকার করে।

ওরা ছিল প্রভাবশালী, মন্ত্রী–এমপি সব ওদের পক্ষে। তারপরও ওরা আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আমার স্ত্রী জানতো, যদি একবার ওর বাবার জামিনে নিয়ে যেতে পারে তাহলে নিশ্চিত চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড।

ওদের সব চেষ্টা যখন বিফল হলো তখন চক্রান্ত করে আমাদের আরো বিচ্ছিন্ন করতে চাইলো। আগেই আমরা আভাস পেয়েছিলাম যে, জেলারের সঙ্গে কারসাজি করে আমাদের রাজশাহী কারাগারে পাঠানো হতে পারে। এমন এক আশংকার মধ্যে গভীর রাতে জমাদার উচ্চ স্বরে জানিয়ে দিল আগামীকাল আমি, দুলাভাইসহ আরো কয়েকজনকে এস্কর্ট করে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে।

শুনে সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় দুই চোখের পাতা একত্র করতে পারলাম না। জেলখানায় কাগজ কলম রাখতে দিতো না। তবুও কাগজ কলম যোগাড় করে আবছা অন্ধকারে প্রিয়তমার কাছে যা মনে হয় লিখলাম। সব চিঠিগুলো এক হাজতির মাধ্যমে পৌছানোর ব্যবস্থা করলাম।

ভোরে আমাদের পায়ে বেড়ি পড়ানো হলো। জোড়া জোড়া হ্যান্ডকাফ লাগানো হলো। এরপর পৃজন ভ্যানে রেলস্টেশনে।

মানুষ আমাদের দিকে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে যেন চিড়িয়াখানার জন্তু। সেদিন লজ্জায় মনে হয়েছিল ধরণি তুমি দ্বিধা হও।

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা যেন শেষ হয় না। ট্রেন লেট।

অনেকক্ষণ পর যখন ট্রেন এলো তখন সমস্যা দেখা দিল ট্রেনে উঠবো কিভাবে? দুই পায়ে বেড়ি। অনেক কষ্টে পুলিশ ট্রেনে ওঠালো।

প্রচণ্ড গরমে বন্দী অবস্থায় ট্রেনযাত্রা করলো রাজশাহীর উদ্দেশ্যে।

আমার দুলাভাই ছিলেন খুবই ধর্মভীরু এবং আত্মবলে বলিয়ান। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতেন, অথচ আমার কারণেই তিনি আজ বন্দী।

মানুষ ট্রেনে চড়ে তার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে গমন করে, কতো স্বপ্ন দেখতে দেখতে ট্রেনের ঝম ঝম শব্দে পথ চলে! কিন্তু আমি! পেছনে প্রিয়তমাকে ফেলে এলাম। জানি না কি ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো বা এখন পর্যন্ত সে জানতেও পারেনি তার প্রেমিক এখন বিরহ যাত্রা করছে ট্রেনে।

গাদাগাদি করে পায়ে বেড়ি ও হাতে হাতকড়া নিয়ে এই বিরহ ট্রেন যাত্রা ছিল আমার জীবনের এক দুঃসহ ট্রেন যাত্রা। জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা যেন আজও মনে পড়ে।

এর প্রায় দুই মাস পর পরীক্ষার কারণে আমার জামিন মঞ্জুর হয়।

পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় আমার বৃদ্ধ পিতা জামিন নামা নিয়ে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে আসেন।

ছাড়া পাওয়ার পর বাস টার্মিনালে এসে দেখি নওগা যাওয়ার শেষ গাড়িটা চলে গিয়েছে। ট্রেনও নেই, অথচ যেকোনো উপায়ে যেতেই হবে। আগামীকাল সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু। বাবার কাছে যে টাকা ছিল তা বখশিশ (?) দিতে দিতে প্রায় শেষ।

পরে বাসে গেলাম নাটোর। প্রচণ্ড ক্ষিধে ছিল পেটে। কিন্তু টাকা নেই পর্যাপ্ত।

রাত একটার পর সান্তাহারগামী একটা ট্রেন এলো। লোকাল ট্রেন। পিতা-পুত্র ট্রেনে উঠলাম। আলো বিহীন এক বগিতে বসার জায়গা হলো। মশার কামড় খেতে খেতে যাত্রা শুরু করলাম। কি যে ভালো লাগছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলাম। দুই মাস আগের স্মৃতি ভেসে উঠলো যখন বন্দী অবস্থায় এ পথেই ট্রেনে গিয়েছিলাম। আর আজ একই পথে মুক্ত হয়ে ফিরছি।

আমার জামিনের আগে মেজআপা ও দুলাভাই জামিন পেয়ে বের হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমার প্রিয়তমা তার বাবার পক্ষে জামিনে বের হয়নি। তাই মুক্তিও পায়নি। সেই ইতিহাস আরেক দিন বলবো।

শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই জয় হয়েছে। প্রতাপশালী বাদীপক্ষ চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। যেহেতু আমাদের ভালোবাসা ছিল নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাই আমরা সরাসরি ঐশী সাহায্য লাভ করেছিলাম। আমার মুক্তির এক মাস পর আমার প্রিয়তমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসি।

আজ আমরা সুখী, ভীষণ সুখী। সশস্ত্র বাহিনীর এক সম্মানজনক পদে আজ আমি কর্মরত।

*চট্টগ্রাম থেকে*

# সুখের কষ্ট

**- বর্ষা**

অপ্রত্যাশিতভাবে ও এলো আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে।

অপ্রত্যাশিত এ কারণে যে, আমি এখন এক সন্তানের জননী, আমার স্বামী রয়েছে। আর সে-ও বিবাহিত, রয়েছে সন্তান। সর্বোপরি আমরা দুজন দুই ধর্মের অনুসারী।

ও আমার জীবনের সব সেরা পাথেয়। ও আমার চলনে-বলনে, চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে সর্বক্ষণ বিদ্যমান। ওকে এক দণ্ড না দেখলে জীবন আমার কাছে অর্থহীন। ওর চোখ, চেহারা, ব্যবহার আমাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। আমার দুঃসহ, একঘেয়েমি, ক্লান্তিকর জীবনে ওর উপস্থিতি যে কতো সুখের, আনন্দের তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

এমনি বহমান সময়ের একদিন ওর কাছে ট্রেনে ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। ও সানন্দে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কিভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে সে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। যাহোক, বাচ্চা, স্বামী, পরিবারের সদস্যদের ম্যানেজ করে খুলনা রেলস্টেশনে সন্ধ্যায় হাজির হলাম। সেখানে ও আগে থেকেই হাজির। প্ল্যান হলো দিনাজপুর যাবো। স্বপ্নপুরী, রামসাগর ঘুরবো। রাতে হোটেলে থাকবো। পরদিন সকালে আবার খুলনায় ফিরবো।

ট্রেন রাত পৌনে নয়টায় ছাড়লো। নির্ধারিত আসনে দুজন বসলাম। বুকে ভয়, কখন জানি পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ, তেমন কারো সঙ্গে দেখা হলো না।

মাঝরাত পার হলো। ঝিক ঝিক ট্রেনের শব্দ, মৃদুমন্দ দোলা। মনের মাঝে নানান রঙয়ের রোমান্স। এর মধ্যে দুষ্টুটা আমার কোলে মাথা রেখে ট্রেনের লম্বা সিটে সটান শুয়ে পড়লো।

আমার শাড়ি দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দিলাম।

ও দুষ্টুমি করতে চাইছে।

আমার শরীর কথা বলতে আগ্রহী।

ফাজিলটা আমার ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলেছে।

আমার স্তনের নিপল এখন ওর ঠোটে।

আমার সারা শরীর শিহরিত।

রোমাঞ্চিত।

কিন্তু বাস্তবতায় এর চেয়ে এগোনোর সুযোগ নেই।

এমনিভাবে ভোরে পার্বতীপুর পৌছালাম। ওখান থেকে দিনাজপুর। সারাদিন রামসাগর, স্বপ্নপুরী দেখলাম, ঘুরলাম। এতো লং জার্নি ও কষ্টের মধ্যেও কখন যে, দিন কেটে গেল টের পেলাম না। কিন্তু সবচেয়ে সুখের কষ্ট হলো সমাজ, লোকলজ্জা ইত্যাদির ভয়ে রাতে হোটেলে থাকা হলো না। হলো না সাগর মন্থন করা।

এই দুঃখ ও না পাওয়া যেন স্বর্গীয় আনন্দের। কারণ ওর সঙ্গে ভ্রমণটুকু আমার জীবনের সেরা দিন, সেরা রোমান্স, সেরা শিহরণ।

রাতের ট্রেনেই খুলনা ফিরলাম। কিন্তু ফেলে এলাম আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের, সুখের স্মৃতিময় একটি ট্রেন জার্নি। এমন কষ্টের আনন্দে মরে যেতেও ভয় নেই।

জানি না আমাদের এ সৃষ্টি ছাড়া ভালোবাসার শেষ কোথায়?

তাই বিধাতার কাছে প্রার্থনা, এ জীবনে শক্তি দিও এ সুখের কষ্ট বহন করার এবং পরজীবনে ওকে একান্তই আমার, শুধু আমার করে দিও।

*খুলনা থেকে*

# বুমেরাং

**- সুমন দেবনাথ**

আজ অনেক বছর হলো ব্রুনাই-তে এসেছি। এখানে দেখার মতো তেমন কিছুই নেই। এমনিতে দেশের লোকজন শান্তিপ্রিয়, তার ওপর রাজতন্ত্র। সুলতান হলেন দেশের সর্বেসর্বা। সমস্ত ক্ষমতা তার কাছেই।

স্থানীয় লোকজন এবং আমার কিছু বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারলাম এখানে দেখার মতো সুন্দর একটা জায়গা আছে। তা হলো *জেরুওং পার্ক*। পার্কের নাম শোনার পর থেকেই দেখার জন্য মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করছিলাম। কিন্তু সময় এবং কাজের চাপে আমার সেখানে যাওয়া হয়ে উঠছিল না।

২০০৪ সালের ১৫ জুলাই ছিল সুলতানের জন্মদিন। দেশের সকল অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল। আমাদের ফ্যাক্টরিও বন্ধ। তাই সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম জেরুওং পার্কে যাওয়ার। সন্ধ্যায় প্রায় এক হাজার ছেলেমেয়ে রওনা দিলাম পার্কের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পার্কে এসে পৌছালাম। বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড জুটি বেধে ঘুরছিল। আর যাদের বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড ছিল না তারা দল বেধে ঘুরছিল। তেমনি আমার দলে ছিল অফিসের দশটি ডানা কাটা পরী।

যাক, আমরা সকলে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেলাম। খাবারের বিলটা আমাকেই পরিশোধ করতে হলো। কারণ এই দলে আমি ছিলাম একমাত্র ছেলে।

এবার আসি মূল ঘটনায়। আমরা বিভিন্ন জায়গা দেখতে দেখতে *বুমেরাং* ট্রেনের সামনে এসে দাড়ালাম। এই রকম অদ্ভুত ট্রেন আমি কখনোও আগে দেখিনি। এতো স্পিডে চলে যা আমার কাছে কল্পনার বাইরে। ফুটবলের মতো গোল চাকতির ভেতর দিয়ে কয়েকটা পাক দিয়েই মানুষগুলোকে উপর-নিচে করে একদম উপরে নিয়ে যায়। আবার কয়েক সেকেন্ড পরে একইভাবে নিচে নেমে আসে। আর মানুষগুলোর ভয়ে কি যে আর্ত চিৎকার করে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমরা সবাই দাড়িয়ে দেখছি, কেও ওঠার সাহস পাচ্ছি না। কেননা প্রতিবার ট্রেন আসার পর দেখতে পাই কেউ হয়তো পায়খানা করে দিয়েছে, কেউ প্রস্রাব করে দিয়েছে, কেউ বা বমি করে দিয়েছে। আরো দেখতে পেলাম প্রায় সকলকেই ধরে নামাতে হচ্ছে। এসব দেখে খুব মজা পাচ্ছিলাম।

আমার মুখের হাসি মিটে গেল যখন আমার কানে এসে অফিসের স্টাফ ফিলিপিনো মেয়ে নিকা বললো, সুমন, তুমি যদি এই ট্রেনে বসতে পারো তুমি যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই বলে উঠলো, সুমন, তোমার ভালো সুযোগ, এই সুযোগ মিস করো না।

নিকার মতো সুন্দরী মেয়েকে কাবু করার এটাই সুযোগ। মনে মনে আমি ভয়ে অস্থির। বললাম, আমি পারবো না।

তারা বললো, তুমি বাংলাদেশি পুরুষ, কেন পারবে না! আমরা জানি বাংলাদেশিরা খুব সাহসী হয়।

আর যায় কোথায়! প্রেস্টিজের কথা ভেবে উপরওয়ালাকে স্মরণ করে ট্রেনে গিয়ে বসলাম। মনে করেছিলাম বসেই চলে আসবো। কেননা নিকা বলেছে শুধু বসার জন্য, চলার জন্য নয়।

বসার পরই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। কারণ বসার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের সামনে দিয়ে এক ধরনের হাতল এসে আমাকে চেয়ারের সঙ্গে আটকিয়ে ফেললো। শত চেষ্টা করেও হাতলটা সরাতে পারলাম না।

নিকার দিকে একবার তাকালাম।

ওরা সকলেই হাসছে যেন আমাকে কাবু করতে পেরে ওয়ার্ল্ড কাপ জয় করেছে। বার বার আঙুল তুলে গুড লাক দেখাচ্ছে।

এর মধ্যেই ট্রেন ধীর গতিতে উপরে ওঠা শুরু করলো। এতো উপরে উঠলো, নিচের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একদম খাড়াভাবে উপরে উঠে এসে থামলো। তারপর দুইবার হুইসল দিল। এ যেন হুইসল নয়, আমার বুকে হাতুড়ি দিয়ে কেউ বাজনা বাজাচ্ছে। শক্ত করে ধরে বসে আছি। এরপর শুরু হলো যাত্রা। চোখ খুলতেই পারলাম না। শ্বাস পর্যন্ত ঠিকভাবে নিতে পারছিলাম না। একবার মনে হলো পড়ে যাচ্ছি। মাথা আমার নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আর পা উঠছে উপরের দিকে।

ট্রেনের যাত্রী সকলেই ভয়ে চিৎকার করছে।

উপরে গিয়ে ট্রেন থামলো। ভাবলাম এ যাত্রায় বেচে গেছি। যখন বুঝতে পারলাম ট্রেন ভ্রমণ শেষ হয়নি, সাময়িক বিরতি মাত্র, তখন আমার গলা শুকিয়ে গেল। অনেক আগেই হার্ট বিট বেড়ে গিয়েছিল, এখন দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে।

আবারও দুটো হুইসল এবং উল্টোভাবে ট্রেন চলা শুরু করলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জ্ঞান হারালাম। মুখে পানির পরশ পেলাম, এতোটুকু মনে আছে আর কিছুই বলতে পারবো না।

রাত দুটোর পর জ্ঞান ফিরে পাই। চোখ মেলে বুঝতে পারি হাসপাতালে শুয়ে আছি। আমার সামনে দাড়িয়ে আছেন কম্পানির ম্যানেজার, আমার কিছু বন্ধু এবং আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নিকা।

ম্যানেজার বললেন, কেমন লাগছে এখন।

অনেক কষ্টে বললাম, আমি কি বেচে আছি?

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

একে একে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। শুধু নিকা রয়ে গেল আমার কাছে। নিকা উঠে দরজাটা বন্ধ করে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার ঠোটে, মুখে, কপালে চুমু দিয়ে ভালোবাসার আগাম সংবাদ জানিয়ে দিল।

সে বললো, সুমন, আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি। আমার জন্য আজকে তোমার এই অবস্থা। আমি যদি এভাবে তোমাকে না বলতাম, তুমি ট্রেনে উঠতে না। তোমার কাছে আমাকে সমর্পণ করলাম। তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলেই বুঝবো, আমাকে তুমি ক্ষমা করেছো। এই বলে সে আমার বুকে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ওকে কিছুই বলতে পারিনি। কেননা আমার প্রথম ভালো লাগা, প্রথম ভালোবাসা ইতিকে এখনো খুজে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো।

*ব্রুনাই, দারুসসালাম থেকে*
sumandebnath@hotmail.com

# একাত্তরে

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর স্মৃতি রোমন্থন করতে পুলকিত অনুভব করছি। যদিও স্মৃতিটা নিজের বোকামির তবুও এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক অপূর্ব তৃপ্তি।

১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকসেনাদের বর্বর আক্রমণ আর নির্যাতনের হাত থেকে বাচার জন্য সীমান্তবর্তী জেলার শান্তিপ্রিয় মানুষ নিজেদের জান-মাল, ইজ্জত রক্ষার জন্য অভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইনডিয়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। যুবকেরা ছুটেছে দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিতে।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়ে গেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে যোগদানপত্র দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন সবে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছি। বাবা-মায়ের সঙ্গে দেশ ছেড়ে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে আশ্রয় নিয়েছি।

সরকারি নির্দেশ পালনের জন্য কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একাকী না যেয়ে দুই বন্ধু নিতাই ও আলাউদ্দিনকে সঙ্গী করলাম। বন্ধুরা বর্তমানে একজন বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা, অপরজন উত্তরা ব্যাংকের কর্মকর্তা।

সম্ভবত মে মাসের ১৫ তারিখ, ১৯৭১ সাল। কৃষ্ণনগর রেলস্টেশনে তিন বন্ধু ট্রেনের অপেক্ষায় সিমেন্টের তৈরি আসনে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাপ্ত সংবাদ নিয়ে আলোচনায় মেতে আছি। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে হাজির হলো। শিয়ালদহ অভিমুখী ট্রেন এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে আবার এখানেই যাত্রা শেষ করে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করলাম যে, ট্রেন ছাড়ার আগে ঘণ্টা বাজবে, গার্ড হুইসল বাজাবে, তারপরে ট্রেন ভেপু বাজিয়ে যাত্রা শুরু করবে। ওমা, অবাক কাণ্ড! আমাদের তিন বন্ধুকে বোকা বানিয়ে গার্ডের হুইসল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন চলতে শুরু করলো। বৈদ্যুতিক ট্রেন। মুহূর্তেই গতি বেড়ে গেল। আমরা কেবল বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ট্রেনের চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম।

নিজেদের বোকামি বুঝতে পেরে নিজেরাই গোপনে লজ্জিত হলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম, এই বোকামির কথা কেউ কোনোদিন প্রকাশ করবো না। পরের ট্রেনে অবশ্য কলকাতা গিয়েছিলাম।

দীর্ঘ দিন পর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে লিখেই ফেললাম। কারণ অভিজ্ঞতাটা তিক্ত হলেও স্মৃতিটুকু মধুর। আশা করি, আমার দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করবে। কারণ মানুষ অতীত স্মৃতি নিয়েই তো বেচে থাকে! এই স্মৃতি কখনো বা দেয় আনন্দ, কখনো দেয় দুঃখ। কবির ভাষায়

*I gazed and gazed but little thought,*
*what wealth show to me had I brought.*

*চুয়াডাঙ্গা থেকে*

# সেই সময়

- হাসান মীর

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে এক সময় ট্রেন লাইন ছিল – ভেড়ামারা রায়টা ব্রাঞ্চ লাইন। ঈশ্বরদী থেকে দর্শনা হয়ে রায়টা পর্যন্ত সকালে ও রাতে দুবার ট্রেন আসতো। নাম ছিল *রায়টার লোকাল*। শতবর্ষের পুরনো সেই রেলপথ অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশ আমলে উঠে গেছে। সেই রেলপথের জায়গায় এখন এলজিইডির পাকা সড়ক হয়েছে, বাস, ট্রাক চলে। ব্রাঞ্চ লাইনটি উঠে যাওয়ায় ভেড়ামারা স্টেশনের সঙ্গে বহু বছর যে *জাংশন* শব্দটি যুক্ত ছিল তাও উঠে গেছে।

আব্বা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর রেলওয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। রেলওয়ের খুপরি মার্কা কোয়ার্টারে থাকতাম। সারাক্ষণ ট্রেনের শব্দ আর ইঞ্জিনের হুইসল শুনতাম। হুইসল শুনেই বলতে পারতাম কোন লাইনের কতো নাম্বার ইঞ্জিন। শব্দ শুনেই বোঝা যেতো কোনটা লোকাল ইঞ্জিন, কোনটা মেইল আর কোনটা মালগাড়ি টানা দৈত্যাকার সিডাবলিউডি ইঞ্জিন। এ দেশে তখনো ডিজেল ইঞ্জিনের আমদানি হয়নি। সবই ছিল কয়লাচালিত স্টিম ইঞ্জিন।

আব্বার চাকরির সুবাদে রেলওয়ের সব কর্মচারীই আমার চাচা হতেন। ছোটবেলায় কখনো টিকেট কিনে ট্রেনে ভ্রমণ করিনি। অনেক সময় গার্ড অথবা চেকারকে আগেই বলে নিতাম, চাচা, অমুক জায়গায় যাচ্ছি।

চাচা বলতেন, সামনের ইন্টার ক্লাসে বসো।

কেউবা আব্বার কুশল জানতে চাইতেন। জানতে চাইতেন, কিরে, তোর বাবা এখনো হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে নাকি?

সেই পঞ্চাশের দশকে ট্রেনে চারটি শ্রেণী বা ক্লাস ছিল। থার্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাস। ট্রেনের ভেতর ইংরেজি ও বাংলায় লেখা থাকতো *নিজে টিকেট কিনুন, মালের ওপর নজর রাখুন। জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।*

এখনো সে রকম কিছু লেখা থাকে কি না জানি না। তখন চেইন বা শিকল টেনে গাড়ি থামানোর জরিমানা ছিল পঞ্চাশ টাকা, এখন সম্ভবত দুইশ টাকা। সেই আমলে রেলওয়ের আরেকটা বৈশিষ্ট ছিল ট্রেনের সময় সূচিসহ আট আনা দামের একটি গাইড বই। এতে অনেক তথ্য থাকতো।

ট্রেনের গায়ে এখন BR লেখা থাকে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে ছিল PER, তারও আগে EBR এবং দেশ বিভাগের সময় EIR. তখন ট্রেনের বাইরের রঙ ছিল লাল। মেইল ট্রেনগুলোর একটা বগিতে বোতল ভর্তি সোডা লেমনেড বিক্রি হতো। দাম ছিল চার আনা। রেলওয়ের কেটারার ছিল *সোহরাবজি* নামের কোনো এক পার্সি।

আমার স্কুল জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে কুষ্টিয়া জেলার পোড়াদহে। পোড়াদহে তখন কোনো হাই স্কুল ছিল না। আমি সেভেন এইট দুই বছর ভোড়ামারা হাই স্কুল আর নাইন টেন দুই বছর কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুলে পড়েছি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে।

ট্রেনে স্টুডেন্ট কনসেশনের মান্থলি টিকেট ছিল। পুরো মাসের জন্যে থার্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল সম্ভবত ছয় টাকা। একবার মজার ঘটনা ঘটেছিল। স্টেশনের বুকিং অফিসে নতুন মাসের জন্যে তখনো আমার মান্থলি টিকেট আসেনি। ফলে প্রথম কয়েকদিন বিনা টিকেটেই যাওয়া-আসা করছি। স্টুডেন্ট হওয়া ছাড়াও আব্বার চাকরির সুবাদে বিনা টিকেটে ভ্রমণের একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। তবু একদিন বিপত্তি ঘটলো।

রেলওয়ের কোয়ার্টারে আমাদের দুই প্রতিবেশী ছিলেন গফুর সাহেব আর কবির সাহেব নামের দুই টিকেট কালেক্টর বা টিসি। কবির সাহেবের ছিল প্রায় আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে। নাম ধরা যাক শিরিন।

ক্লাস নাইনেই বড় বেশি নিমাই, আশুতোষ, নীহারঞ্জন আর বিমলমিত্র পড়ার সুবাদে পেকে গিয়েছিলাম। শিরিনের প্রেমে পড়ে গেলাম এবং একদিন তার হাতে একটা প্রেমপত্রও ধরিয়ে দিলাম।

কবির সাহেব মেয়ের কাছে বিষয়টি জেনে আমার ওপর ভীষণ খাপপা হলেন। সম্ভবত সহকর্মী গফুর সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করলেন।

সেদিন স্কুলে যাওয়ার জন্যে ট্রেনে উঠেছি। যথানিয়মে টিকেট বিহীন অবস্থায়। হঠাৎ গফুর চাচা স্টেশনে থেমে থাকা ট্রেনে উঠে আমার টিকেট দেখতে চাইলেন এবং টিকেট নেই জেনে আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে টিসিদের রুমে ধরে আনলেন। এর মধ্যে ট্রেন ছেড়ে গেলে তিনি বিনা টিকেটে ভ্রমণের দায়ে ভাড়া ও জরিমানা মিলিয়ে আমাকে সম্ভবত আট কিংবা নয় টাকা চার্জ করলেন।

সঙ্গে অতো টাকা ছিল না। কে একজন বললো, ভাড়া দিতে না পারলে জিআরপি অর্থাৎ রেল পুলিশের হাতে হ্যান্ডওভার করেন, ওরা কোর্টে চালান দিয়ে দেবে।

এর মধ্যে কার মুখে খবর পেয়ে জানি না, আব্বা বাসা থেকে ছুটে এলেন। আমার মতো তিনিও এই ঘটনায় হতবাক! একই স্টেশনে একজন সহকর্মীর ছেলেকে বিনা টিকেটে ভ্রমণের দায়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে জরিমানা করা নিতান্তই অস্বাভাবিক ঘটনা। ফলে নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা রহস্য রয়েছে এ কথা অনুমান করে তিনি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

রাতে বাসায় ফিরে আব্বা ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে তিনি সব ঘটনা জেনে এসেছেন। তবু আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমি নিরুত্তর দাড়িয়ে।

আব্বা পা থেকে স্যান্ডাল খুলে পিঠে, মাথায়, মুখে দমাদম মারতে শুরু করলেন, হারামজাদা, স্কুলের পড়া শেষ না হতেই প্রেম করতে লেগেছো? তোমার প্রেম করা শেখাচ্ছি ...।

মা এসে কোনোক্রমে উদ্ধার করলেন।

এভাবেই আমার জীবনের প্রথম প্রেমের ইতি ঘটলো।

এর কয়েক মাস পর কবির সাহেব পার্বতীপুর বদলি হয়ে গেলেন। তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। তবে ঈশ্বরদী স্টেশনে বারকয়েক গফুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি কোনো কথা বলেননি। আমিও না।

*রাজশাহী থেকে*

## ভানুর গল্প

**- গিয়াসউদ্দিন লিটন**

রেল ভ্রমণ সংক্রান্ত একটা গল্প।

চলন্ত ট্রেনে ভানু বন্দোপাধ্যায় পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে ঝুলছে, এই চেইনটা কিসের?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, জরুরি মুহূর্তে এই চেইনটা টান দিলে রেল থেমে যায়। বিনা কারণে চেইন টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

ব্যাপারটা সত্যি কি না দেখার জন্য ভানুবাবু চেইনটা টান দিলেন।

ট্রেন থেমে গেল।

সিকিউরিটির লোক এসে জানতে চাইলো কে, কেন চেইন টেনেছে? ভানুর কাছ থেকে সন্তোষজনক কোনো জবাব না পেয়ে বললো, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিন।

ভানুর সেক্রেটারি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিল।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো।

ভানু চেইনে আবার দিলেন টান।

আবার জরিমানা, আবার টান ...।

সিকিউরিটি এসে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

ভানু বললেন, *এতো চ্যাতেন ক্যান, আমি জরিমানার টাকা কম দিতাছি নাকি?* সেক্রেটারিকে বললেন, *নিতাই, বাবুকে অ্যাডভান্স পাচশ টাকা দিয়ে দে। আমি চেইন টানমু আর যামু, টানমু আর যামু। দেখি কোন শালা কি করে?*

*সোনাগাজী, ফেনী থেকে*

# পাস

**- হেলাল**

কিছুদিন আগের ঘটনা। ময়মনসিংহ থেকে *তিস্তা এক্সপ্রেস*-এ ঢাকায় আসবো। সঙ্গে আমার এক বন্ধু ফখরুল। দুজনে টিকেট কাটার জন্য কাউন্টারের কাছে গেলাম। সেখানে দাড়ানো এক দালাল আমাদেরকে অন্য রকম প্রস্তাব দিল। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার ভাড়া একশ দশ টাকা। তাকে চল্লিশ টাকা দিলেই সে আমাদের টিকেটের বদলে দুটি পাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

তার ভাষ্যমতে জানলাম, রেলের প্রত্যেক কর্মকর্তা, কর্মচারীর নামে বেশ কিছু টিকেট বরাদ্দ থাকে। সময় ও সুযোগের অভাবে অনেকের জন্য ভ্রমণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ দিকে বরাদ্দকৃত বছরের টিকেট ওই বছরে গ্রহণ না করলে তা পচে যায়। সে কারণে অনেকেই সেগুলো পাস আকারে বিক্রি করে দেয়। আমাদের যে দুইটি টিকেটের বিপরীতে পাস দেয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটি আসলে তাই।

প্রস্তাব পেয়ে ফখরুল আমাকে একটু ফাকে টেনে নিয়ে বললো, খারাপ হবে না! একশ দশ টাকার বদলে চল্লিশ টাকা!

ফখরুলের সায় পেয়ে দালালের প্রস্তাবে রাজি হলাম।

দালাল তার পকেট থেকে ছয় বাই চার ইঞ্চি মাপের একটি হলুদ প্যাড বের করলো। সেখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে, ময়মনসিংহ জাংশন, তারিখ, ট্রেনের নাম্বার, আসন নাম্বার ইত্যাদি ছাপার অক্ষরে লেখা। সেখানে আমাদের দুজনের নাম ওঠানো হলো। পিতার নাম লিখলো জয়েনউদ্দিন, পেশা রেলের ফিটার। এসব তথ্য লিখে স্টেশন মাস্টারের ঘরে নিজে সই ও সিল মেরে কাগজটি আমাদের হাতে তুলে দিল। এবং বললো, কমলাপুর স্টেশনের গেটে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে যেন বলি জয়েনউদ্দিন, পেশা জানতে চাইলে বলবো রেলওয়ের ফিটার। এ কথা বলে সে দ্রুত কেটে পড়লো।

ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাড়াতেই আমরা পরম আহ্লাদের সঙ্গে ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। আসন অনেক ফাকা ছিল। সে কারণে নিজস্ব আসন খোজাখুজি না করে দুজনে ফাকা আসন পেয়ে মুখোমুখি বসলাম।

সিটে আয়েশ করে বসার পর ফখরুলকে বললাম, তোর পিতার নাম কি?

ফখরুল গাল ফাটিয়ে হেসে বললো, জয়েনউদ্দিন। বলেই আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তোর?

আমিও হাঃ হাঃ করে হেসে বললাম, জয়েনউদ্দিন।

কিন্তু দুজনের একজনও এ কথা একবারও ভাবলাম না, একই পিতার সমবয়সী দুই ছেলের চেহারায় এতো অমিল কেন? আমি ফর্সা হালকা পাতলা গড়নের, চিকন ঠোট। আর ফখরুল যেমন মোটকা তেমন কালো, নিচের ঠোট রক্ত খাওয়া জোকের মতো পুরু।

মাঝপথে টিকেট চেকিংয়ে কোনো সমস্যা হলো না। খিলগাও রেলগেটে এসে ট্রেন খুব স্লো হলো। বিনা টিকেটধারীরা যেন ঝপাঝপ লাফ দিতে পারে। একবার ভাবলাম এখানে নেমে পড়ি। আবার ভাবলাম এখানে নামতে যাবো কোন দুঃখে। আমরা তো সবার মতো বিনা টিকেটধারী নই যে, স্লো ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামবো। আমাদের টিকেট না থাকলেও পাস আছে। আমরা রেল বিভাগের লোক।

কিন্তু সিদ্ধান্তটি না নেয়া যে কতোটা ভুল হয়েছে তা টের পেলাম কমলাপুর প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে। কথায় আছে, *যম ছাড়ে তবু কমলাপুরের টিটি ছাড়ে না*। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সব ইনটেলেকচুয়াল টিটিদেরকে এখানে পাঠানো হয়। এই সেই কমলাপুর!

ট্রেন থেকে নেমে গেটের দিকে যেতে যেতে ফখরুলকে আবারও মনে করিয়ে দিলাম। ফখরুল, পিতার নাম মনে আছে তো?

ফখরুল তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বললো, জয়েনউদ্দিন। পেশা ফিটার।

কিন্তু এই হাসি বেশি সময় টিকলো না।

গেটের মুখে টিকেটের বদলে পাস দিতেই টিটি আমাদেরকে বেরুনোর অনুমতি না দিয়ে পাশে দাড়াতে বললেন। ভাবলাম রেল বিভাগের ছেলে হওয়ার কারণে আমাদের জন্য হয়তো বিশেষ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে।

ফখরুল আমার দিকে ভ্রূ কুচকে জানতে চাইলো, ব্যাপার কি?

বললাম, হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবে।

টিকেটধারী যাত্রীরা একে একে সবাই যাওয়া শেষ হলে টিটি দুজন আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এসে কথা নেই, বার্তা নেই দুজনকে দুদিকে ডেকে নিয়ে গেল। এটু তফাতে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার বাবার নাম কি?

আমি ডাটফাটের সঙ্গে বললাম, জয়েনউদ্দিন।

কথা শেষ হতে না হতেই জানতে চাইলো, দাদার নাম?

বুকটা ধপ করে উঠলো। কেননা আমরা শুধু পিতার নামের রিহার্সাল দিয়েছিলাম।

আমি ইতস্তত করতেই টিটি বললো, শিক্ষিত ছেলে হয়ে নিজের গ্র্যান্ডফাদারের নাম বলতে পারেন না। বলেন, আপনার দাদার নাম কি?

বাধ্য হয়ে আসল নাম বললাম, কাজী আবদুল হালিম।

একটু পর দুজনকে আবার একত্র করা হলো।

টিটি দুজন একটু তফাতে গিয়ে দাদার নাম যাচাই করে ফিরে এসে বললেন, আপনাদের জবানবন্দি মোতাবেক জানা গেল, আপনারা উভয়ে ফিটার জয়েনউদ্দিনের ছেলে। তা মানলাম। কিন্তু একজন দাদার নাম বলেছেন কাজী আবদুল হালিম, অন্যজন বলেছেন শেখ করিম। আপনারাই বলেন, আপনাদের পিতা জয়েনউদ্দিনকে কি দুই ব্যক্তি পয়দা করেছে। এ কথা বলেই টিটি দুজন কসাই হাসি হাসতে লাগলেন।

জীবনে এই প্রথম কঠিন বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম।

কসাই হাসি থামিয়ে তারা বললেন, আপনারা যে ভুয়া পাস নিয়ে ট্রেন ভ্রমণ করেছেন তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

উত্তরে ফখরুল কিছু একটা শোনাতে যেতেই টিটি তাকে থামিয়ে বললেন, এতো কথায় কাজ নেই। আপনারা ছাত্র মানুষ। আপনাদের কাছে ফাইন নেবো না। যা ভাড়া তা দিয়ে মানে মানে কেটে পড়েন। তা না হলে বড়বাবুর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে গেলে নির্ঘাত তিন দিনের জেল, উপরন্তু জরিমানা। হাজতের মশার কামড় বোনাস।

ততোক্ষণে ভাড়ার টাকা গুণে রেখেছিলাম। *আক্কেল সেলামি* হিসেবে তা টিটির হাতে তুলে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়লাম।

*ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে*

# কাপুরুষ

**- জি এম নুরুজ্জামান**

কু–ঝিক–ঝিক করে ট্রেন চলা শুরু। প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি তখনো দূরে। কষে দৌড় দিলাম। শেষ কম্পার্টমেন্টের দরজার রডে হাত দিয়েও যখন তা ফসে যাচ্ছিল, আমার আত্মা ভয়ে খাচা ছাড়ার যোগাড়। কিন্তু কেউ একজন আমাকে খপ করে টেনে তুললো। টেনশনে বুঝতেও পারিনি একজন মহিলা আমাকে প্রায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে বাচিয়ে দিলেন। ওঠার পর বুঝলাম আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে এনেছেন একজন কম বয়সী মহিলা।

ওঠার পর আমাকে তিনি শাসন শুরু করলেন, এভাবে কেউ ওঠে? আপনি যেভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন, দরজায় কেউ দাড়ানো না থাকলে আজ আপনার খুব বড় একটা ক্ষতি কিংবা মৃত্যুও হতে পারতো। জীবনের প্রতি বুঝি কোনো মায়া নেই!

কি করবো ম্যাডাম, সময়ের দামটা যে জীবনের চেয়ে কম নয়। হাপানো অবস্থায় ঠোটে হাসি ঝুলিয়ে একটা প্রত্যুত্তর দেয়ার চেষ্টা করলাম।

কি এমন জরুরি কাজ যার জন্য জীবনকে পরোয়া না করে ট্রেনে চড়তে হবে?

তার কথায় মৃদু তিরস্কারও রয়েছে সেটা কথার সুরে বোঝা গেল।

দৌড়ে ট্রেনে, বাসের রড ধরে ওঠা, চলাফেরা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ম্যাডাম। আজকে আসলে আপনার অতো কথা শোনানোর জন্যই বিধাতা আমাকে এ অবস্থা করেছিল।

মহিলা দেখি আমার জবাবে অসন্তুষ্ট।

এবার আসল কথাটা বললাম, বেকারদের কাছে ইন্টারভিউর গুরুত্বটা বোঝেন ম্যাডাম! আজ একটা ইন্টারভিউতে চেহারাটা দেখাতে যাবো তো, তাই।

কি আপনি ম্যাডাম, ম্যাডাম করছেন। আমার নাম কলি। আমাকে বুঝি খুব বড় দেখায়।

তার কথায় একটু লজ্জাই পেলাম। না, তা নয়। আপনি অপরিচিতা। হুট করে একজনকে সম্বোধন করতে হলে তো প্রথমে এসবই চলে, সে জন্য।

সব বলছেন, নিজের নামটা তো বললেন না এখনো।

নাম বললাম। নাম শুনে দেখলাম তার অবয়বে অকস্মাৎ নেমে এলো একরাশ বিষাদের গাঢ় ছায়া।

ইতিমধ্যে তার গন্তব্য স্টেশন এসে গেল। সে বললো, আমি তো এখানে নেমে যাবো। আপনি যদি আমাকে একটা ফোন করবেন আশ্বাস দেন তবে আমার মোবইল ফোন নাম্বারটি দিয়ে যাই।

আশ্বাস দিলাম।

সে ফোন নাম্বারটি লিখে বিষণ্ন বদনে নেমে গেল।

তার বিষণ্নতা আমাকেও যেন অনেকটা গ্রাস করলো। কেন করলো তার ব্যাখ্যা আমিও জানি না।

ইন্টারভিউ কেমন হলো তা যারা নিয়েছেন তারাই জানেন। আমি শুধু এতোটুকু জানি, আমাকে তারা আটকাতে পারেনি কোনো প্রশ্ন করে।

ইন্টারভিউ টেনশনে এতোক্ষণ সেই ট্রেনের সহযাত্রীর কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। একটা ফোনের দোকান চোখে পড়তেই মনে পড়লো তার কথা। পকেট হাতড়ে টাকা-পয়সার অবস্থা দেখলাম।

ও প্রান্তে যেন আমার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল। আমি যে ফোন করবো সে রকম একটা আত্মবিশ্বাসও যেন তার ভেতরে ছিল।

হ্যালো বলতেই জানতে চাইলো ইন্টারভিউ কেমন হলো। একটু ঝাঝের সঙ্গে জবাব দিলাম, সেটার উত্তর কি আপনি মনে করেন আমার কাছে আছে!

সরি, বুঝতে পারিনি, অপ্রিয় একটা প্রশ্ন করা হয়ে গেল। সরিটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে তো?

না, না, আপনি আমাকে সরি বলতে যাবেন কেন। আপনার সাহায্যে মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে এলাম। আপনি সব কিছুর উর্ধে।

থাক, এতো প্রশংসার দরকার নেই। আপনার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষায় আছি। চলে আসুন।

স্টেশনে আমার জন্য একটি মানুষ কেন অপেক্ষায় সে চিন্তা মাথায় এলো না। তাকে দেখে চনমনে হয়ে উঠলো মনটা। ট্রেনে ওঠার পর সে আমার জন্য তার কাধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে খাবার বের করে দিল।

ট্রেন তার আপন গতিতে চলছে। তার কথা শুনছি। তার সব কথা কেন যে আমার কাছে বলছে এটা খুব অবাক ব্যাপার। তবে এতোক্ষণে বুঝেছি তখন আমার নাম শুনে তার তখনকার বিমর্ষতার কারণ। আসলে

ভালোবেসে বিয়ে করা মানুষকে মাত্র নয় মাসের মাথায় হারাতে হয়। মোটর সাইকেল চড়া অবস্থায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান তার প্রিয় মানুষ জামান। ঘটনাক্রমে আমিও জামান নামধারী। সবচেয়ে কাকতালীয়, আমিও আজকে দুর্ঘটনায় প্রাণবায়ুটা হারাতে বসেছিলাম প্রায়। বিপদ থেকে পরিত্রাণ করলো কলি।

আমার গন্তব্য তার স্টেশনের আগে।

আমি নামতে চাওয়ার কথা বললে সে বললো, প্লিজ, যদি আমাকে নামিয়ে পরের ট্রেনে ফেরেন তাহলে কি খুব অসুবিধা হবে?

আমি পকেটের অবস্থা জানি, ফিরতি ভাড়া আমার কাছে হবে না। অনেকটা নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললাম। আসলে, যেতে অসুবিধা নেই কোনো। কিন্তু টিকেট কাটার পয়সা যে আমার কাছে নেই।

কলি বললো, আমার ওপর বুঝি কোনো ভরসা নেই?

বললাম, এ রকম আশ্বাস দেবেন না। তবে বেকাররা সবাই আপনার পরিচয় জানলে আর পিছু ছাড়তে চাইবে না। চাকরি খোজার ইচ্ছা মোটেও থাকবে না কারোর।

অন্য কারো কথা অন্য কেউ জানুক, আমি শুধু আপনাকে জানি।

তার কথায় কোনো দুষ্টুমির আভাস পেলাম না, মোটেই না। একেবারে সিরিয়াস সে। খুব চমকে উঠলাম তার অভিব্যক্তিতে। কারণ আমি তার পরিচিত মাত্র আজকের এতোটুকু। সে আমার মাঝে কি আবিষ্কার করলো যার জন্য আমাকে এমন করে নিজের ভাবছে।

এক সময় আমরা অধিকারে মনে মনে তুলে দিলাম একে অন্যের হাতে। দুজন দুজনকে ভালোবাসি কথাটা নিজেরাই বুঝে নিলাম। আমাদের ভালোবাসার তরী পালে হাওয়া লাগিয়ে দুজনকে ভাসিয়ে নিল অবারিত সুখের সাগরে। সব পূর্ণতায়ও আমার চাকরিটা এখনো অধরা রয়েই গেল। একা হলে বেকারত্ব আমাকে যন্ত্রণায় পিষে যায় কেবল।

কলির সঙ্গে কোথাও বেড়াতে বেরুলে আমার পকেট থাকে ফাকা। কলির সামনে এমন একটা ভাব করি যে, ও খরচ করলে আমি মোটেই লজ্জা পাই না। কিন্তু সত্যি কথা কি, ভেতরে ভেতরে লজ্জায় একেবারে শেষ হয়ে যাই।

কলি আমাকে অবশ্য সান্ত্বনা দেয়, এখন আমি যা খরচ করছি, সব হিসাব করে রাখছি, তোমার চাকরি হলেই আদায় করে নেবো।

সব হতাশার মাঝে একরাশ আলো নিয়ে একটি খাম আমার নামে এলো। তাতে আমার মতো বেকারের জন্য একটা চাকরির এপয়েন্টমেন্ট লেটার।

চাকরিতে ঢুকে কয়েক মাস পেরুলো। পরিবারের সকলে আমার চাকরি প্রাপ্তিতে বেশ খুশি। আর আমার খুশি তো শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানোর মতো। কারণ এবার বলতে পারবো কলির কথা।

কলিকে একদিন বাসায় নিয়ে এলাম।

কলি সবার সঙ্গে এমনভাবে মিশলো যেন সে আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য।

কলি চলে যাওয়ার পর বাবা-মাকে বললাম, তাকে আমার জীবনসঙ্গী করতে চাই।

বাবা-মা নির্দ্বিধায় আমার মতে নিজেদের সায় আছে জানালেন।

বর সেজে আমি গেলাম কলিদের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ে পড়ানো হবে। এর মাঝেই একটা সোরগোল শোনা গেল। আমার বাবা বর মঞ্চের পাশে এসে আমার হাত ধরে টেনে ওঠালেন।

জানতে চাইলাম, কি হয়েছে?

বাবা বললেন, এ বিয়ে হতে পারে না। এ মেয়ের আগে একবার বিয়ে হয়েছে, স্বামী অকালে মরেছে যার, সেই অপয়া মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।

আমাদের পাড়া–মহল্লার সকল মুরুব্বিরা বাবার সঙ্গে এক মত।

তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলতে পারলাম না। পারলাম না মৃদু প্রতিবাদও করতে। উঠে এলাম কলির ভালোবাসার অমর্যাদা করে কাপুরুষের মতো।

কলি কি যন্ত্রণা পেয়েছে, তার মনে আমার প্রতি কতো ধিক্কার সে জানলাম কয়েক ঘণ্টা পর যখন তার আত্মহত্যার খবর পেলাম। আমার চোখে পানি নামছে বানের পানির মতো। কিন্তু জানি, ভালোবাসার মানুষের জন্য কাপুরুষের চোখে পানি থাকে না।

*নারায়ণগঞ্জ থেকে*

# স্ট্যানডিং

**- জুয়েল**

আমি এবং আমার বন্ধু সাইদুল যাচ্ছিলাম ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা।

ভোরের ট্রেন *একতা* ছাড়বে পৌনে পাচটায়। আমরা স্টেশনে পৌছালাম সাড়ে চারটায়। টিকেট আনতে গেলাম কাউন্টারে। গিয়ে দেখি সেকেন্ড ক্লাস সিট সব বুকড হয়ে গেছে। শুধু স্ট্যানডিং টিকেট বিক্রি করছে।

কি আর করা! স্ট্যানডিং টিকেট কেটে ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন ছাড়লো। ট্রেন চলছিল তার আপন গতিতে আর আমরা ঘুরছিলাম খালি সিটের আশায় এই বগি থেকে সেই বগিতে।

ট্রেন চলছে, আমরা ঘুরছি। ততোক্ষণে আমাদের ট্রেন টংগি পার হয়ে তার পরের স্টেশনে এসে দাড়িয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম দুটো খালি সিট। আমি এবং সাইদুল সেই সিটে গিয়ে বসলাম। তবে সেই দুটি সেকেন্ড ক্লাস নয়, ফার্স্ট ক্লাস সিট ছিল। সিটে বসে আমরা দুজন খুব খুশি হলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বিপদে পড়তে হলো।

দুজন জমিয়ে গল্প করছিলাম। ট্রেনটি আবার ছাড়লো এবং এয়ারপোর্ট স্টেশনে গিয়ে থামলো।

সেদিন সকালে এয়ারপোর্ট স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ট্রেন থেকে ধড়পাকড় চলছে।

টিটি এসে সবাইকে সতর্ক করলেন।

কিন্তু আমরা দুজন এমনি গল্পে জমেছিলাম যে, টিটির কোনো কথা আমাদের কানে এলো না।

কিছুক্ষণ পর টিটি এবং পুলিশ এক সঙ্গে বগিতে এলো। একে একে চেক করে আমাদের সিটের সামনে এসে আমাদের টিকেট চাইলেন।

সাইদুল গল্প করতে করতে টিকেটটি টিটির কাছে এগিয়ে দিল।

টিটি টিকেট হাতে নিয়ে বললেন, এদের নিয়ে যাও।

আপনারা আসেন।

পুলিশ এসে হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। ট্রেন থেকে নিচে নামার পরেই বুঝতে পারি আমাদের হাতে কেন হাতকড়ি লাগানো হয়েছে।

সাইদুল বললো, কি হয়েছে রে?

তাকে ইশারায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যানারটা দেখালাম।

তারও বুঝতে বাকি রইলো না যে, হাতকড়া কেন লাগানো হয়েছে।

স্টেশনে নিয়ে আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের দাড় করানো হলো।

অনেকক্ষণ হয় দাড়িয়ে আছি। আমাদের প্রচণ্ড ক্ষিধে লাগলো। এক কলাওয়ালাকে ডাক দিলাম।

কিন্তু সে আমাদের এই দিকে এলো না।

বুঝতে পারলাম সে পুলিশের ভয়ে আমাদের কাছে এলো না।

এভাবে আরো অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হলো আমাদের। এবার সত্যিই স্ট্যানডিং অবস্থায় এতোক্ষণ দাড়িয়ে থেকে বুঝলাম স্ট্যানডিং টিকেটে সিটিং টিকেটে বসলে কি হতে পারে। এবং পুলিশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের আর কতোক্ষণ দাড় করিয়ে রাখবেন?

সে জবাব দিল, জজ সাহেব আসার পর আপনাদের ছাড়া হবে।

আমাদের ক্ষিধে আরো বাড়লো। আস্তে আস্তে শরীরের সব শক্তি যেন চলে যাচ্ছিল। অবশ হয়ে পড়ছিলাম দুজনাই।

এক সময়ে জজ সাহেব এলেন। দুপুর বারোটার দিকে এসে একে একে জরিমানা আদায় শুরু হলো।

অবশেষে আমাদের জরিমানা আদায় করে তবে আমাদের ছাড়া হলো।

*আকুয়া, ময়মনসিংহ থেকে*

# অ্যামট্র্যাক

**- ড. রওশন জাহান**

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমার ছেলে বৌ-এর কাছে বেড়াতে গিয়েছি আমেরিকার শিকাগোতে। ১ অক্টোবর আমার বড় বোনের মেয়ে রুমি আর তার স্বামী ড. রফিক আহমেদ উইসকনসিন শিকাগো ড্রাইভ করে এসে আমাকে নিয়ে যায় তাদের ছোট শহর *লা-ক্রস*-এ।

রফিক তখন উইসকনসিন ইউনিভার্সিটি অ্যাট লা ক্রসে ভূগোলের সহযোগী অধ্যাপক।

এক সপ্তাহ তাদের সঙ্গে আনন্দময় দিন কাটানোর পর একা ফিরে আসি শিকাগোতে ট্রেনে। Amtrak-অ্যামট্র্যাক। সে এমন একটা ট্রেন যাত্রা যা আজও ভুলিনি।

রেলের বগিতে আমরা একদল যাত্রী। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। কেউ বা বই পত্রপত্রিকা পড়ছে, কেউ উদাসীন হয়ে তাকিয়ে আছে। সেটা ছিল দিনের বেলা, রাত নয়। তাই বলা যাবে না।

*কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম*

*রজনী নিঝুম।*

ঘুম নেই। কিন্তু কোথাও এতোটুকু প্রাণের স্পন্দন ছিল না। রেলগাড়িও চলছে না আমাদের দেশের মতো ঝমঝম করে। নিঃশব্দ এর গতি। যদিও শম্বুক গতি নয়। স্টেশনগুলো আসছে, চলে যাচ্ছে। কোনো হই চই নেই। মনে হচ্ছিল যেন কি মিস করছি।

কি?

বুঝলাম মিস করছি আমাদের দেশের রেল স্টেশনের হই হট্টগোল, চা গরম, চিনাবাদাম এসব হাক-ডাক। দেশে একেকটা স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে হুড়োহুড়ি-চেচামেচি। বগির ভেতরে সাময়িকভাবে হলেও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা, গল্পগুজব ইত্যাদি।

আমাদের দেশের জার্নিটা বড় বেশি প্রাণবন্ত। এখানে বড় বেশি প্রাণহীন।

কোনটা ভালো?

এক সময় আমার মনে হতো লাগলো যেন একটা মৃত দেশের মধ্য দিয়ে একটা ভুতুড়ে গাড়ি একদল মানুষ সদৃশ মূর্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য টুকটাক দুই চারটি কথাবার্তা, নড়াচড়া, এনাউন্সমেন্ট এসব হচ্ছিল যে না তা নয়। কিন্তু আমাকে তো স্পর্শ করেনি। আমার দেশের প্রাণচঞ্চল ট্রেন যাত্রাকে প্রতি মুহূর্তে মনে করতে লাগলাম। সব কিছু বিস্বাদ লাগতে শুরু হলো।

অবশেষে গন্তব্যস্থল শিকাগো এসে পৌছে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

আমার জীবনে আমি অনেকবার ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এমন নিরানন্দময় ট্রেন জার্নি আমার ঘটে আর ঘটেনি।

*মায়ামি, ইউএসএ থেকে*

# বীভৎস

## - রাহিমীনা জাহান লিপু

আড়াই বছর আগের ঘটনা। চার বোন, দুই দুলাভাই এবং তিন ভাগ্নে-ভাগ্নি মিলে আমরা সবাই ট্রেনে করে সিলেটে যাই ঘুরতে। যাওয়ার সময় অবশ্য ট্রেনের জানালার কাচে লেগে আমার ভাগ্নের হাত যায় কেটে। এই অবস্থায় সবাই মিলে সিলেটে ঘোরাঘুরি শেষ করে সিদ্ধান্ত নিই চট্টগ্রাম ঘুরবো।

ব্যস, সবাই মিলে চলে যাই চট্টগ্রামে। সেখানে তিন দিন কাটানোর পর চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ আমার সেজআপার মেয়েটা ট্রেন জার্নি করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সবাই মিলে চট্টগ্রাম ঘুরে ট্রেনে চলে আসি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আসে *তিতাস ট্রেন,* যে ট্রেন দিয়ে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নরসিংদীতে যাবো।

আমাদের ট্রেনের ইঞ্জিন যখন লাগাচ্ছিল, আমরা সবাই চোখের সামনে দেখলাম ষোল সতেরো বছরের একটি ছেলে ট্রেনের নিচে ঝাপিয়ে পড়লো।

চোখের সামনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে দেখে আমরা তো হতবাক! ছেলেটার হাত পা কাটা অবস্থায় সবাই ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পরে জানতে পারি ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। ছ্যাক খেয়ে এমন কর্মটি করেছে। ভালোবাসার জন্য প্রাণ দিয়েছে।

আমাদের ট্রেন ছাড়ার সময় হলে আমরা ট্রেনে চড়ে চলে আসি নরসিংদীতে। নরসিংদী স্টেশনে নামার পাচ মিনিট পরই জানতে পারি সেই একই ট্রেনের নিচে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে আমাদেরই অতি পরিচিত একজন। মা-বাবার অতি আদরের একমাত্র ছেলে ছিল সে। তারও আত্মহত্যার কারণ ছিল প্রেমে ব্যর্থতা।

একটি ট্রেন দুই দুজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল। জানি না নরসিংদী স্টেশন থেকে কমলাপুর স্টেশনে যাওয়ার পথে আরো কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে কি না।

বুঝি না মানুষ জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্য ট্রেনকেই কেন বেছে নেয়!

এতো বাজেভাবে নিজেকে না মারলেই কি নয়?

*পূর্ব ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী থেকে*

# নয় মাসের সফর

## - মাহবুবুর রহমান ভূইয়া মনজু

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিন। প্রত্যহ দলে দলে পাকিস্তানি সৈন্য দেশে আসছে, গ্রাম থেকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাই প্রতিটা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-যুবকেরা গ্রাম ছাড়া। অনেকে প্রাণ বাচাতে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ প্রতিরোধ করতে জড়ো হচ্ছে। যারা প্রতিরোধের চিন্তা করছে তারা গ্রুপে গ্রুপে ইনডিয়া যাচ্ছে।

আমাদের গ্রামের বাড়িটা আবার বিলোনিয়া সীমান্তের কাছাকাছি হলেও প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও মায়ের নিষেধের কারণে যেতে পারছিলাম না। অবশ্য পরে অবাধ্য সন্তানের মতো পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

আমি এবং পাশের বাড়ির সমবয়সী দুজন, এই আমরা তিনজন। সিদ্ধান্ত হলো ফেনী রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে বিলোনিয়া সীমান্ত হয়ে ইনডিয়াতে যাবো। সেই সময়ে আমাদের এলাকার লোকজনের জন্য এ ট্রেনটাই ছিল অবলম্বন। বর্তমানে এই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ।

ট্রেন ছাড়ার আগেই রেলস্টেশনে পৌছে যাই। স্টেশনে এসেই দেখা হয়ে গেল আমাদের মতো জনা বিশেক বিলোনিয়াগামী যাত্রীর সঙ্গে। এদের মাঝে অনেকেই ছিলেন যারা যুদ্ধ পরবর্তী এবং বর্তমানে ফেনী জেলার আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সক্রিয় নেতা।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। আর আমরা পাকিস্তানি প্রতিরোধকামী জনতা ট্রেনে গল্পগুজবের হাট বসালাম।

ঘণ্টা খানেকের ভেতর আমরা বিলোনিয়া সীমান্তের কাছাকাছি পৌছালাম। আমাদের এগিয়ে নিতে ওপার থেকে এলেন ইনডিয়ান ফোর্সের দুই সৈন্য আর বাঙালি এক মুক্তিসেনা। আমাদের সবাইকে তারা নিয়ে গেলেন সীমান্তবর্তী আগরতলার এক ক্যাম্পে। পরে জেনেছি সেই বাঙালিভাই ছিলেন ফেনীর জয়নাল হাজারী।

ক্যাম্পে একে একে সাতদিন কাটালাম। ট্রেনিংয়ের কিছুই দেখলাম না, শুধু রোজ সকালবেলা ইনডিয়ান সেনারা আমাদের ক্লাস নেয়ার নামে পাকিস্তান বিরোধী কল্পকাহিনী শোনাতেন।

আমরা এসব শুনে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতাম। তাই ক্যাম্পে আমার মন টিকলো না। বেরিয়ে পড়তাম ইনডিয়ার বিভিন্ন জায়গায়। নিকটবর্তী রেলস্টেশনে ঘুরে বেড়াতাম। ইচ্ছে হলেই চড়ে বসতাম বিভিন্ন স্টেশনগামী মেইল ট্রেনে, কখনো মান্ধাতার আমলের কয়লার ইঞ্জিনে আবার কখনো দ্রুতগামি ট্রেনে। শুধু দুপুর ঘনিয়ে এলে ফিরে আসতাম ক্যাম্পে। কারণ রিফিউজি ক্যাম্প বলে কথা, *খাওয়া ফ্রি*। কখনো–সখনো খাওয়ার সময় ক্যাম্পে দেখা হতো জাসদ নেতা জয়নাল আবেদিন ভিপি, আবদুল রহমান বিকম, খোন্দকার মোজাম্মেল, ছাগলনাইয়ার হান্নানের সঙ্গে। খেয়ে–দেয়ে আবার চড়তাম রেলস্টেশনে। শিয়ালকোট, শিয়ালদহ, আগ্রা, আজমীরসহ বহু জায়গায় ট্রেনে চড়ে ঘুরেছি।

এসব ট্রেনে চড়তে তখন অবশ্য টিকেট লাগতো না। কারণ টিকেট কালেকটর আমাকে চিনতেন এপারের শরনার্থী বাঙালি বলে।

অবশেষে পাকিস্তানি সেনারা ফেনী দখল করলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহমদের ডাকে আমরা ফেনীতে ফিরে আসি। ফেনী শহরকে পাকিস্তানি মুক্ত করি। ফেনী রেলস্টেশনকে শত্রুমুক্ত রাখতে আস্তানা খাটাই ফেনী রেলস্টেশনে।

দেশ স্বাধীন হলে গ্রামে ফিরে যাই, দেশ পুর্নগঠনে হাত দিই।

রাজনীতি পছন্দ করিনি। তাই নেতা হইনি। এক বন্ধুর সাহায্যে রেলওয়েতে চাকরি পাই। চাকরি করি দীর্ঘ দিন। অবশেষে ১৯৮৫ সালে অবসরে যাই।

*মালিপুর ভূইয়াবাড়ি, ফেনী থেকে*

# সিরাজ- উদ- দৌলার বাড়ি

**- হাবিবা**

১৯৯৩ সালের মার্চ মাস। আমাদের বিয়ের তৃতীয় বছর। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গেলাম ইনডিয়াতে। সাতক্ষীরা হয়ে ছোট ননদের বাড়িতে বেড়িয়ে ইনডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এই প্রথম নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া। একটু রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলো। কয়েকদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে নতুন বৌ হিসেবে বড় ননদের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। যাওয়ার সময় কলকাতায় গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম। বিকেলে গড়িয়াহাটে শপিং করলাম, তারামণ্ডল দেখলাম, এসপ্লানেডে পাতাল রেলে

চড়লাম। কি সুন্দর ঝকঝকে পরিষ্কার ট্রেনের বগি! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেমে পড়তে হয়। সব স্টেশনে টেলিভিশন সেট করা রয়েছে। খুব ভালো লাগলো।

দেশে কখনো রেলগাড়িতে উঠিনি। রাস্তায় দাড়িয়ে সন্ধ্যার পরে ফুচকা খেলাম। আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকাল সাতটার ট্রেন ধরলাম।

হাওড়া রেলস্টেশন থেকে টেনে উঠলাম মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখতে দেখতে গন্তব্যে পৌছালাম রাত এগারোটায়। ওখানে দুই এক দিন বেড়ানোর পর ভাগ্নে এবং তার মা বললেন মুর্শিদাবাদের সেই ঐতিহাসিক সিরাজ-উদ-দৌলার বাড়ি দেখতে যাওয়ার জন্য।

সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে আবারও ট্রেনের অপেক্ষায় মেইন রোডে বসে থাকা। প্রথমে বলে রাখা ভালো যে, সেদিন ছিল ট্রেন ধর্মঘট। আমরা যে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম তার দূরত্ব বাড়ি থেকে হাফ কিলোমিটার। ওই স্টেশনে তেমন একটা ট্রেন থামে না।

সকাল থেকে বসে আছি, ট্রেন আর আসে না। দুপুর গড়িয়ে গেছে। পেট ক্ষিধেয় চো চো করছে। এর মধ্যে একটা ট্রেনও আসেনি। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। তখন আমার খুব বিরক্ত লাগছিল। বাড়ির পাশে বসে থেকে না খেয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না। আমার শ্বাশুড়ি সঙ্গে ছিলেন। তার কোনো রকম খারাপ লাগছিল না। কেননা তিনি খুব বেড়াতে পছন্দ করেন।

ট্রেন আসছে না দেখে ভাগ্নেকে বললাম, চলো, বাড়ি ফিরে যাই।

সে বললো, মামি আর কবে আসবেন তার ঠিক নেই। আপনাকে নবাববাড়ি না দেখিয়ে বাড়ি ফিরবো না।

পরে আমরা হেটে হেটে তার পরের স্টেশনে গেলাম এবং ঠিক তখনি একটি লোকাল ট্রেন এসে থামলো। তাতে চড়ে বসলাম। আঙ্গুর কিনে খেলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পর যেখানে নামলাম সেখানে আমার খুব ভালো লাগলো। নবাবদের পারিবারিক গোরস্থান। বিভিন্ন রঙের গোলাপ ফুলে সুশোভিত হয়ে আছে বাধানো কবরগুলো। গঙ্গার এপারে। নৌকায় গঙ্গা নদী পার হলাম। স্বচ্ছ পানি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ওপারে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার স্মৃতিময় ঐতিহাসিক হাজারদুয়ারী, নবাবের পালিয়ে যাওয়ার গোপন নদীপথ, নবাবী আমলের মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে।

দেখে খারাপ লাগলো। তবে নবাববাড়ি গেলাম ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। আমার সারা দিনের সব ক্লান্তি ঝরে গেল নিমেষেই।

রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকায় তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। নবাবের যুদ্ধাস্ত্র, বাসন-কোসন, কাপড়, টুপি সামান্য কিছু খোলা থাকায় তা দেখেই ফিরে এলাম। কারণ তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এবার ভাবলাম বাসে করে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু স্টেশনে এসে ভালো বাস না পেয়ে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল একটা লোকাল ট্রেন আসতে পারে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা ট্রেন এলো। আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে বলে মামা-ভাগ্নে ট্রেন থেকে নেমে কিছু মিষ্টি কিনতে গেল। ঠিক দশ পনেরো মিনিট পর ট্রেন ছেড়ে দিল। তারা তো আর আসে না।

আমার তো খুব টেনশন হচ্ছিল। আমার শ্বাশুড়িকে বললাম, ওরা আসছে না কেন?

ট্রেনের হুইসল শুনে তারা দৌড়াতে দৌড়াতে কোনো রকমে চলন্ত ট্রেনে উঠে এলো।

তখন হাফ ছেড়ে বাচলাম।

বাড়িতে আসতে রাত এগারোটা বেজে গেল।

*পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, মিরপুর, ঢাকা থেকে*

# থ্রিনটথ্রি- র গুলি

**- মোরশেদ**

হেডলাইন পড়ে অনেক পাঠক হয়তো ভড়কে যাবেন। না, ভড়কানোর কোনো কারণ নেই। কেননা এমন একটা বাস্তব ঘটনা ট্রেন ভ্রমণের সময় আমার পাশের সিটেই ঘটেছিল।

তখন আমি ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। কলেজ ছুটি হওয়ার সুবাদে একবার রংপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। সঙ্গে ছিল কলেজের কিছু জুনিয়র ছেলে। বাড়ি খুলনা এলাকায় হওয়ায় ট্রেন ছিল নিরাপদ এবং একমাত্র মাধ্যম। একমাত্র বলছি কারণ, তখন আজকের মতো বাস সার্ভিস এতো বিস্তৃত ছিল না।

ট্রেন একমাত্র বাহন হওয়াতে ট্রেনে ছিল অস্বাভাবিক চাপ অর্থাৎ ভিড় ছিল বেশি যেটা আমরা প্রায়ই বাড়ি ফেরার সময় অনুভব করতাম। ফলে আমাদের যাত্রার শুরুটা স্টেশনে হওয়াতে সুবিধাটা আমাদের পক্ষেই থাকতো বরাবরের মতো।

মূল ঘটনায় যাওয়ার আগে কলেজে থ্রিনটথ্রি (303) রাইফেলের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু অবতারণা করা দরকার। আমাদের কলেজে তিনশ তিন মডেলের কিছু অকেজো রাইফেল ছিল। সামরিক বাহিনীর কোনো পদস্থ কর্মকর্তার আগমন উপলক্ষে ওই রাইফেলগুলো মাঝে মধ্যে ব্যবহার হতো তাকে গার্ড অফ অনার দেয়ার জন্য। খেলার ছলেই বলেন অথবা দুষ্টুমির ছলেই বলেন, এই রাইফেলগুলো নিয়ে আমরা ফলস লোড করে ট্রিগার টিপতাম এবং মজা করতাম।

সে বছর আমরা কলেজ ছুটির দরুন বাড়ি ফিরছিলাম। তার আগে বলে রাখা দরকার, কলেজ ছুটিতে আমাদেরকে কলেজ ইউনিফরম পরিধান করে বাড়িতে ফিরতে হতো।

খাকি ড্রেসের জোরে আমরা নিজেদের সুবিধার্থে ট্রেনের বগির ভেতরের একটা সাবকম্পার্টমেন্ট প্রায় দখল করেই যাচ্ছিলাম। ঈশ্বরদী এসে অনুভূত হলো প্রচণ্ড ভিড় ট্রেনে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম বাইরে কিছু সৈনিকভাই ও পুলিশের কিছু সদস্য ট্রেনে চড়ার জন্য ফাক খুজছেন। আমাদেরকে খাকি পোশাকে দেখে তারা যেন স্বস্তির আস্বাদ পেলেন। তারা আমাদের বগিতে ওঠার জন্য আমাদের অনুমতি চাইলে তাদের অনুমতি দিলাম।

অনুমতি পেয়ে তারা হন্তদন্ত হয়ে বগিতে ওঠার জন্য তাদের *হাতিয়ার* (সামরিক বাহিনীর লোকেরা রাইফেল বা যে কোনো অস্ত্রকে হাতিয়ার বলে) জানালা দিয়ে আমাদের একজন ক্যাডেটের হাতে দিলেন। জানালা দিয়ে হাতিয়ার উঠিয়ে তারা ট্রেনের দরজা দিয়ে বগিতে উঠে আসছিলেন। এ সময়টুকুর মধ্যেই আমাদের সেই ক্যাডেট হেয়ালির ছলে কলেজের সেই দুষ্টুমির বাস্তব রূপ দিয়ে দিল। অর্থাৎ বগির মধ্যে গুলি হয়ে গেল এবং ট্রেনের ছাদ ভেদ করে গুলি চলে গেল ঊর্ধাকাশে।

বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। দুই তিন মিনিট কানে কিছু শুনতে পেলাম না। উপস্থিত সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে চোখাচোখি করছিল। মুহূর্তেই আমাদের বগিটা ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো যে, কারো দিকে এইম করেনি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতো বড় বিকট শব্দে থ্রিনটথ্রি রাইফেলের গুলিটি ফুটলো সেটা বাইরে এতো কোলাহলের মধ্যেও কেউ টের পেল না। যদিও বাইরে কর্তব্যরত রেলওয়ে পুলিশ দণ্ডায়মান ছিল। টোকাই গোছের একজন লোক টের পেয়েছিল। সে বলেছিল, *গুলি আইছে*। বলতে বলতে আমাদের বগির কাছে আসতেই ভেতর থেকে জয়ানওভাইয়েরা দিল একটা ধমক।

পরে অবশ্য এই ধমকের অর্থ বুঝেছি। তখন ছাত্র অবস্থায় বুঝিনি। এই ধমকের অর্থ ছিল চাকরি বাচানো। যার রাইফেলের গুলি বেরিয়েছিল সে হয়তো গোজামিল দিয়ে গুলির হিসাবে মিলিয়েছেন এবং চাকরি বাচিয়েছেন।

সৈনিক ভাই এবং পুলিশভাইয়েরা সাবধান। কখনো ভুলেও হাতিয়ার অন্যের হাতে দেবেন না।
পাঠকদের অবগতির জন্য বলছি, আমাদের সেই ক্যাডেট এখন আর্মির একজন মেজর।

*পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, খুলনা থেকে*

# সুইডেন থেকে আনা কোট

**- মাহিন**

১৯৮৫ সাল। নতুন বিয়ে করেছি। শ্বশুরবাড়ি উত্তরবঙ্গের জেলা শহর রংপুর। আমার বাড়ি ব্রহ্মপুত্র বিধৌত শহর জামালপুরে। এ দুই স্থানের যাতায়াত মাধ্যম ট্রেন। বিয়ের পর পর বারকয়েক স্ত্রীকে নিয়ে এ দুই শহরে যাতায়াত করতে হয়েছে। মাধ্যম ট্রেন।

একবার শীত ছুই ছুই করছে। শীতের সময়ে আপাতত শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসা হবে না বিধায় শাশুড়ি উপাদেয় সব পিঠাপুলির আয়োজন করলেন।

আমি আবার ভোজনরসিক।

জিভে জল আসা নানান পদের সেই সব পিঠা খুব খেলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় জামালপুর আসার ট্রেন। অতি ভোরে শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো রকমে চা নাশতা খেয়ে বের হলাম রংপুর রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলাম তলপেটের চাপ। প্রাতঃকালীন প্রাকৃতিক কাজটি সারা হয়নি।

ইতিমধ্যে আমাদের রিকশা রংপুর স্টেশনে হাজির। স্ত্রীসহ প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখেই ঢাকাগামী *তিস্তা এক্সপ্রেস* এসে উপস্থিত। আমাদের আগেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কাটা ছিল। বগি নাম্বার মিলিয়ে উঠে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে দাড়ানো নতুন শ্যালকের সঙ্গে বিদায়পর্ব সমাধা না করতেই প্রবলভাবে তলপেটের চাপ অনুভূত হতেই স্ত্রীকে কোনোমতে সিটে বসিয়ে ট্রেনের টয়লেটের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম।

কিন্তু বিপদের যে তখনো বাকি বুঝতে পারিনি। হবুচন্দ্র রাজা আর গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পের মতো। আমি যেন দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী। কিন্তু হলে হবে কি! ট্রেনের টয়লেটে প্লাস্টিকের বদনা আছে , পানি নেই। পড়লাম মহা ফাপরে।

আজি থেকে ঊনিশ বিশ বছর আগে এখনকার মতো তখন কারো কাছে টয়লেট পেপার বা টিসু পেপার ছিল না। কি করি? ভাবছি। শৌচাকার্য সমাধান না করে কি করে ফার্স্ট ক্লাসে বসা আমার নতুন বৌ–এর কাছে গিয়ে বসি। তারপরও আরো দুই চারজন ভদ্রলোক আছেন। ভাবতেই কেমন গা ঘিন ঘিন করছে।

হঠাৎ। হ্যা, হঠাৎ তখনই ট্রেনের টয়লেটের দরজায় ব্রাকেটে ঝোলানো আমার কোটটির দিকে নজর গেল। আমার বড় ভাই কিছুদিন আগে মস্কো থেকে পিএইচডি করে ফিরেছেন। এ কোটটি আমার জন্য তিনি সুইডেন থেকে কিনেছিলেন। ছুটিতে মস্কো থেকে সুইডেনে যেতেন বেড়াতে মাঝে মধ্যে। কোটটি আমার খুবই প্রিয়। প্রিয় হলে কি হবে, মান বাচাতে, শৌচকার্য সমাধান করতে অগত্যা কোটের লাইনিং (ভেতরের আস্তানা) ছিড়ে ফেললাম। আমি তখন গোপাল ভাঁড়ের সেই রাজার মতো সর্বসুখী। শুধু দুঃখ হচ্ছিল অমন সুন্দর একটা কোটের অকাল পরিণতির কথা চিন্তা করে।

অতঃপর লাইনিং বিহীন কোট পরে টয়লেট থেকে বেরিয়ে মুচকি হেসে স্ত্রীর পাশে বসলাম। ট্রেন তখন রংপুর শহর ছেড়ে কাউনিয়া ধর ধর।

uddinmohi@yahoo.com

# জীবিকা

## - মোহাম্মদ আবদুর রহিম

আমি রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। চাকরি জীবনে কখনো ইঞ্জিনে চড়ে বা ট্রেনের শেষ কোচটির পেছনের জানালা পথে রেলপথের মান পরখ করা, ট্রলিতে যেতে যেতে রেলপথ, সেতু, স্টেশন ভবন পরীক্ষা করা, যাত্রী সেবার মান দেখা এবং রেলপথ মিস্ত্রিদের কাজের মান ও পরিমাণ পরখ করা ইত্যাদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ট্রেন ভ্রমণ যেন আমাদের রক্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ট্রেন ভ্রমণে আমাদের থৃল নেই বটে। তবে মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে ট্রেন ভ্রমণ করতে বৈচিত্র বোধ করি। তাছাড়া এ জাতীয় ভ্রমণকে সফল করতে সবার অজান্তে প্রচুর শ্রম দিতে হয়। এ স্বল্প পরিসরে তারই কয়েকটা রোমন্থন করছি।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সে কালরাতের পর পাকসরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে নারায়ণগঞ্জ সংলগ্ন বুড়িগঙ্গার পশ্চিমপাড়ে মোক্তারকান্দি গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। এ গ্রামেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধারা এসে জড়ো হতে থাকেন। সংলগ্ন স্কুলের মাঠে ট্রেনিং হতে থাকে। আমি এখানেই মুক্তি সংগ্রামে সম্পৃক্ত হই।

অতঃপর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর ঢাকায় চলে আসি। জানতে পারি, রেলওয়ের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ট্র্যাক ছাড়াও তিনশটি সেতু ধ্বংস হয়েছে। ইনডিয়া থেকে অনেক ইঞ্জিনিয়ার এলো। কিন্তু নির্দেশ এলো রেলের পুনর্বাসন আমাদেরই করতে হবে। কাজে ঝাপিয়ে পড়লাম। সেতু পুনর্বাসন করতে গিয়ে ট্রেন চলাচলে কোথাও বিলম্ব হলেই কিছু অবিবেচক যাত্রীর হাতে কতো যে নাজেহাল হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

ভৈরবে মেঘনা সেতুর চারটি স্প্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেতুটি ইনডিয়ার কম্পানি বিবিজে পুনর্বাসন করে। আমি তখন সেতু প্রকৌশলীর দায়িত্বে। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাল। পুনর্বাসনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এলেন সেতুটি উদ্বোধন করতে। যতোদূর মনে পড়ে, সঙ্গে ছিলেন ইনডিয়ার রেলমন্ত্রী, ইনডিয়ার হাই কমিশনার এবং দেশের কয়েকজন মন্ত্রী। সেতুটি পারাপারের জন্য কিছু কোচ ও সেলুন সংযোজন করে ট্রেন গঠন করা হয়। ভৈরব প্রান্তে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। ইনডিয়ার রেলমন্ত্রী একটি খোসা ছাড়ানো নারিকেল ইঞ্জিনের সামনের কাপলারে ভাঙলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধুসহ অতিথিরা ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন মন্থর গতিতে চলতে থাকলো। ট্রেন চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেতুতে করকর আওয়াজ হচ্ছে আর আমার হার্ট বিট বাড়ছে। এমনি করেই আল্লাহর রহমতে ট্রেন নিরাপদে সেতু পার হলো, আমারও মুখে হাসি ফিরে এলো। সেতুটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মেঘনা নদীর ট্রেন ফেরি সার্ভিস বন্ধ হলো এবং ঢাকা–চট্টগ্রাম ও ঢাকা–সিলেট সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ শুরু হলো।

নভেম্বর ১৯৮৩। রানী এলিজাবেথ এলেন রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে। সরকারি সিদ্ধান্ত এলো, শ্রীপুরের নিকটবর্তী বৈরাগীরচালা নামের গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে রানীকে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট–শ্রীপুর যাতায়াত হবে ট্রেনে এবং বাকিটা সড়কপথে। সংশ্লিষ্ট সবাই লেগে গেল যার যার কাজে। বৈরাগীরচালা উন্নীত হলো একটি আদর্শ গ্রামে। চাষী, তাতি, কামার, কুমারদের বসানো হলো গ্রামে। শ্রীপুর থেকে বৈরাগীরচালা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করা হলো, পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর ঠিকঠাক ও রঙ করা হলো।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে শ্রীপুর পর্যন্ত স্টেশনগুলো ঢেলে সাজানো হলো। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনকে পুনঃনির্মাণ করা হলো। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের এপ্রোচে বাগান তৈরি করা হলো। ওঠা–নামার সুবিধার জন্য প্রান্তিক স্টেশনে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে এবং মালামাল লাগিয়ে রেলপথ মেরামত করা হলো।

রানীর যাতায়াতের জন্য একটি ট্রেন গঠন করা হলো। রানী যে সেলুনটিতে বসবেন তা চিহ্নিত করা হলো। সেলুনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পাওয়ার ভ্যান থেকে তার টেনে সেলুনের বিদ্যুৎ বোর্ডে সংযোগ দেয়া হলো। সেলুনের বেডগুলো খুলে বেতের সোফা বসানো হলো। টয়লেটে নিচ থেকে খোলা কমোড বাদ দিয়ে মডার্ন কমোড বসানো হলো। ইঞ্জিন, সেলুন ও গার্ডভ্যানের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি রাখা হলো। রেলপথের নিরাপত্তার জন্য গ্যাংম্যানদের লাইনের পাশে পাহারায় রাখা হলো।

১৬ নভেম্বর ১৯৮৩ সাল। ঢাকা স্টেশনে ফর্ম করা ট্রেন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ভোরেই পৌছে গেলাম। রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদ ও সংশ্লিষ্টরা এলেন। ঘড়ির কাটায় কাটায় রানী এলেন। প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে সবাই গাড়িতে উঠলেন।

ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চললো। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার হিসেবে ট্রেন পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হলো। সেলুনের বিদ্যুৎ বোর্ডের কাছে ওয়াকিটকি নিয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর পরই গার্ড এবং ড্রাইভার নির্দেশ নিচ্ছে। সেলুনের প্রান্তভাগে আছি বলে দোলন বেশি অনুভূত হচ্ছে। ট্রেনটা দুলছে আর আমার হার্ট বিট বাড়ছে।

এক সময় দেখি পাওয়ার ভ্যান থেকে আনা বিদ্যুতের তার দোলনের কারণে স্পার্ক করছে। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার পরিণতির কথা ভুলে গেলাম। হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলাম। অতঃপর টেকনিশিয়ানকে ডেকে তারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করলাম। মহান আল্লাহ তায়ালা সে যাত্রা ভয়ানক এক দুর্ঘটনার পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করে। আল্লাহর রহমতে যথাসময়ে শ্রীপুর পৌছি।

রানী বৈরাগীরচালা দর্শনের পর ফিরে এলে ট্রেনে ওঠার সময় রেলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণের জন্য করমর্দন করেন। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ফিরে এলাম। রানী ও ভিভিআইপিরা নেমে গেলেন। আমরা ট্রেন নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম।

আমাদের কর্মজীবনে থৃল না থাকলেও বৈচিত্র অবশ্যই আছে। অন্য দশটা মানুষের মতো আমাদেরও হৃদয় আছে, আমরাও সংবেদনশীল। জনসাধারণের চাহিদা মতো সেবা দিতে পারলে আমরাও আনন্দিত হই এবং তাদের বিরূপ সমালোচনায় কষ্ট পাই, মনঃক্ষুণ্ন হই।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

# ইনসাল্ট থেকে ইন লাভ

**- মাহমুদুল হক শাহ**

অন্যদিন বেশ সকালে ঘুমিয়ে গেলেও আজ ঘুম আসতে জাভেদের বেশ দেরি হচ্ছে। রাত একটায় মোবাইলটা বেজে উঠলো। অপ্রত্যাশিত কল।

রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, আপনার কাছে একটা মশারি টানানোর দড়ি হবে? একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর।

হ্যা, হবে। জাভেদ তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করলো।

না, না। কোনো দড়ি না। কোনো ভাঙা কয়েল আছে?

হ্যা, তাও আছে।

আর, কোনো এরোসল?

হ্যা, তাও আছে। এবার জাভেদ বেশ মজা পেল।

আপনার কাছে দেখছি সবই আছে।

এখানে সবই আছে। শুধু নেই একজন নারী। আপনি এলেই পূর্ণ হতে পারি।

সেই শুরু। তারপর শুধু ইতিহাস। জাভেদের অনার্স ফাইনাল ইয়ার। আর মেধার শুরু। শাটল ট্রেনে মুখোমুখি বসা। যাওয়া–আসা। আরো কতো কথা!

বিশেষ উপলক্ষে জাভেদ একদিন মেধাকে এক প্যাকেট গিফট দিল। তাতে মশারি টাঙানোর দড়ি, ভাঙা কয়েল, আর একটা এরোসল সযত্নে মোড়ানো ছিল।

বাসায় গিয়ে মেধার চোখ ছানাবড়া। ফোনের সিরিভার তুললো।

আপনি আমাকে ইনসাল্ট করেছেন।

ইনসাল্ট করলেও তো কনসাল্ট করেই করেছি। তাই এটাকে অপমান হিসেবে নেয়া ঠিক না।

জাভেদ কোনো মতে ব্যাপারটা ম্যানেজ করলো।

আরেক দিন।

শাটল ট্রেন বটতলী থামলো। জাভেদকে মেধা একটা খাম দিল।

জাভেদ ভাবলো, নির্ঘাত গালি। বাসায় এসে কম্পিত হৃদয়ে খাম খোলা।

কিন্তু একি!

শাদা কাগজ।

আর তাতে লিপস্টিকে মেধার ঠোটের ছাপ!

*চট্টগ্রাম থেকে*

# নিঃশব্দে চাওয়া

**- আহমেদ নোমান**

সম্পর্কটা আমাদের বেশ অনেক দিনের। এখনো বিয়ে পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। তবে অচিরেই আশা করছি।

যারা আমাদের সম্পর্কটার কথা জানে তারা কেউ মেনে নেয়নি। আর মেনে নেয়ার কথাও না। তবুও দুজন সব কিছু জেনেশুনেই এগোচ্ছি।

আমাদের সবচেয়ে বড় টার্গেট থাকে সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়ানো। তাই দেশের অনেক প্রসিদ্ধ জায়গাতেই আমাদের পদার্পণ অলরেডি হয়ে গেছে।

এবার টার্গেট হলো সিলেট। উদ্দেশ্য জাফলং, মাধবকুণ্ড, শ্রীমঙ্গল, আরো যা যা পারি। আগে আগেই ট্রেনের টিকেট বুক করলাম।

জানি সড়কপথের জার্নিটা মোটেই ভালো হবে না। চার দিন সময়। আমার ইউনিভার্সিটি বন্ধ। আর ওর অফিস ছুটি নিল তিন দিন। মাঝখানে শুক্রবার।

ট্রেনের যাত্রা শুরু হলো দুপুর বারোটায় শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর খেয়াল হলো ফেরার টিকেটটা কনফার্ম করা হয়নি। তাই একটু চিন্তিত হলাম টিকেটের ব্যাপারে। কিন্তু ভুলে গেলাম পাশের মানুষটির কথাতে।

গিয়েই দেখবো কি হয়।

যাবার পথের জার্নিটা চমৎকার হলো। অপরূপ দৃশ্য। পাহাড় আর ট্রেন চলার শব্দ। দুজনই খুব এনজয় করলাম শোভন শ্রেণীর চেয়ারে বসে। কিছুক্ষণ পর পর চা আর দুজনের খোশগল্প। খেয়াল করলাম অন্যান্য যাত্রী আড়চোখে তাকানো। কিন্তু এতোদিন অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। তাই তাতে খুব অবাক হলাম না।

আসলে অবাক হচ্ছে বাকি সবাই আমাদের দেখে। আমাদের সম্পর্কটা কি? কারণ আমার চাইলডিশ ফেইস। ছেলে মানুষের মতো চেহারা। আর ওর চেহারায় বয়সের ছাপটা আছে। সবাই একটা অন্তত ধারণা করছে যে, ভাই আর বোন। এতোসব ভাবনা চিন্তাও আমাদের জানা আছে। তাই কোনো সমস্যা বোধ করিনি।

ট্রেন পৌছালো সন্ধা সাতটায়। রিকশা নিলাম শ্রীমঙ্গলের সবচেয়ে ভালো হোটেলের উদ্দেশ্যে। গেলাম সেখানে। পছন্দই হলো।

বলে রাখি একটা কথা, আমাদের এতোদিনের সম্পর্কে অনেক দিনই এক সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু দুজনার কখনো উদ্দেশ্য ছিল না তা নয়, এক কথায় পণ করেছিলাম যে, কোনো সেক্স রিলেশন হবে না। চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম প্রথম থেকেই। শুধু কিস আর জড়িয়ে ধরা পর্যন্তই। তা সব পরিবেশ বুঝে অনেক দিন পর পর।

রুমটা নিলাম। টুইন বেড। ফ্রেশ হয়ে আবার গেলাম ট্রেন স্টেশনে। উদ্দেশ্য ফেরার টিকেট বুক করা। কিন্তু মাথায় হাত! কোনো টিকেট নেই শ্রীমঙ্গল থেকে।

ওনারা বললেন, সিলেট গিয়ে টিকেট করতে, ওখানে পাওয়া যেতে পারে।

পরদিন মাধবকুণ্ড ঘুরে এসে রওনা দিলাম সিলেটে। পৌছালাম রাত নয়টায়। টিকেট করতে গিয়ে দেখলাম একই অবস্থা। কোনো টিকেট নেই। ব্ল্যাকে গেলাম। তাও নেই। যতো টাকা লাগে তাও পাচ্ছি না।

হঠাৎ করেই শুনলাম কোনো এক রাজাভাইয়ের কথা। তিনি নাকি যোগান দিতে পারেন। তাই খুজতে লাগলাম ওনাকে। কিছুক্ষণ পর পেয়েও গেলাম। কিন্তু নিরাশ হলাম। তবে বললেন, পরদিন সকালবেলায় আসতে।

পরদিনটিই ছিল আমাদের ঘোরার শেষ দিন। তাই চিন্তাটা আরো বেড়ে গেল।

একইভাবে দরগার কাছে একটি হোটেলে উঠলাম। বরাবরের মতোই রাতটুকু কাটলো। যে যার মতোই ঘুমাচ্ছিলাম।

খুব সকালে উঠেই গেলাম স্টেশনে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ব্যবস্থা হলো না। এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, আসল সমস্যাটা কোথায়।

টিকেট আছে। তবে সবই স্টেশন মাস্টারের কাছে। তিনিই অফিসে বসে ব্ল্যাকের মতো টিকেট দিচ্ছেন। কিন্তু দিলে একটা টোকেন দেন। আর সেটা নিয়েই কাউন্টার থেকে টিকেট করতে হয়।

তাই *রাজাভাই* বললেন, নিশ্চিন্তে থেকে সন্ধ্যায় এসে টিকেট নিয়েন।

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জাফলং গেলাম ঘুরতে। চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু সে দৃশ্য মুহূর্তেই ভুলে যেতে হলো যখন সন্ধ্যায় এসে দেখলাম এখনো টিকেট পাচ্ছি না। দেখলাম স্টেশন মাস্টার টোকেন করা অনেককেই দিচ্ছেন।

হঠাৎ মনে পড়লো চাচার কথা। তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলস্টেশনে কর্মরত আছেন। চাচ্ছিলাম চাচার নাম বিক্রি না করেই টিকেট নিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম। কোনো ঘুস ছাড়াই টিকেট পেলাম।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে এতো দুর্নীতি তা আগে জানা ছিল না।

টিকেট পেয়ে নিশ্চিত হলাম যে, আজ ঢাকা যাচ্ছি। কিন্তু আনন্দটা বেশিক্ষণ থাকলো না। যখন ট্রেনে উঠে দেখলাম, যে সিটগুলো আছে সেগুলোতে ফোল্ড করার কোনো অপশন নেই। মানে শটান হয়ে বসে থাকতে হবে। তবে এই রাতে?

আমার মানুষটা দেখলাম আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। মনে হয় এখনই জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। মানে ওর জিদ বেড়ে গেছে। এমনিতেই তার জার্নি সিকনেস আছে। তার উপরে ঘুমকাতুরে।

কোনোমতে তাকে বোঝালাম। কিন্তু খেয়াল করলাম আরো একটা মহা সমস্যা। সিটের পাশে জানালার গ্লাসটা কোনোভাবেই খুলছে না। অনেক চেষ্টা করলাম, কোনো কাজ হলো না। মানে জানালাটা বন্ধই থাকবে। ওর দিকে আর তাকালাম না। জানতাম ওর চেহারাটা কি হবে!

কিছুক্ষণ পর দেখলাম ও খুব স্বাভাবিক। মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে, এতে আমার কোনো হাত ছিল না।

ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আমাদের সামনের দুই সিটে একজন দাড়িওয়ালা পুরুষ আরেকজন অল্প বয়স্কা মহিলা। দেখে খারাপ মনে হলো না। ভেবে নিলাম কোনো সমস্যা হবে না।

ট্রেন ছাড়ার সময় দুজনেই জানতে চাইলেন তোমরা কি ভাইবোন?

হেসে দিলাম দুজনেই। বললাম, না।

তাহলে স্বামী–স্ত্রী?

তাও হেসে দিলাম। আবারও বললাম, না।

এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ওনারা বুঝে নিতে পেরেছেন আমাদের সম্পর্কটা। তাই আর বাকিটা বলতে হলো না। কিন্তু বুঝতে পারলাম ওনারা হিসেব মেলাতে পারছেন না।

ট্রেন ছেড়েছে রাত সাড়ে দশটায়। আস্তে আস্তে সময় পার হতে লাগলো। বুঝতে পারলাম আমার *জান* ঘুমাবে। কিন্তু সে ঘুমাতে পারছে না। তাই আমার ব্যাগটা আমার কোলে রাখলাম। ওকে বললাম, এখানে ঘুমাতে।

সে খুব লজ্জা বোধ করছে। কারণ কম্পার্টমেন্টের অনেকই ঘুমোচ্ছিল না।

ওকে আশ্বস্ত করলাম, কোনো সমস্যা নেই।

তাই ও আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো।

বলে রাখা ভালো আমরা আর যেখানেই গিয়েছিলাম সব জার্নিতেই ও এভাবে আমার কোলে ঘুমাতো।

আমার কোলে ওর ঘুমানোটা প্রচণ্ড ফিল করতাম। সব সময়ই চাইতাম ও এভাবেই থাকুক। যতোক্ষণ ও ঘুমাতো ততোক্ষণ জেগে থাকতাম আর ওর মাথায় হাত বোলাতাম।

রাত বাড়ছে। ট্রেন চলছে আওয়াজ করে। প্রচণ্ড আওয়াজ মনে হচ্ছে। কারণ তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো কথাবার্তা নেই।

হঠাৎ খেয়াল করলাম রাত তিনটা বাজে। প্রতিটি মানুষই তাদের সিটে একইভাবে ঘুমাচ্ছে। শুধু আমি আর ওই ব্যতিক্রম।

সময় যাচ্ছে, আমিও ঘুমে কাতর হয়ে পড়লাম। কিছু করার নেই। ওকে নাড়ানো যাবে না। ঘুম ভেঙে যাবে। তাই ওর পিঠেই মাথা দিয়ে ঘুমালাম। ভালোভাবে ঘুমাতে পারলাম না। কারণ ওকে এতো ভালোবাসি যে, বলে বোঝাতে পারবো না। ওর পিঠে মাথা রাখায় ওর ঘুমের সমস্যা হচ্ছে কি না, কষ্ট পাচ্ছে কি না এ চিন্তাগুলো করেই আবার সোজা হয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুম ভঙলো। জানতে চাইলাম কি সমস্যা?

বললো, কিছু হয়নি।

আবার বললাম তাহলে ঘুমাও। এখনো অনেক দেরি।

এবার সে আমার কোলে না, কাধে মাথা দিয়ে ঘুমালো। তাই প্রচণ্ড ফিল করলাম।

আমি আর ঘুমলোম না। ওর যেন কোনো সমস্যা না হয় সেটাই খেয়াল রাখলাম।

সকাল হলো। সবাই দেখি জেগে আছে।

সমানের মহিলা দেখি হঠাৎ করেই কথা বলে উঠলেন। তিনি আমার চাচা। তার মানে ওনার পাশে যে দাড়িওয়ালা লোকটা ছিল তিনি ওনার চাচা। আরো জানলাম, মহিলা আজকে সউদি আরব যাবেন। ওনার স্বামী ওখানেই থাকেন।

ভালোই মনে হলো ওনার কথা শুনে।

তারপর বললাম, আমি কমপিউটার ইনজিনিয়ারিংয়ে পড়ছি শেষ সেমিস্টারে। আর ও চাকরি করছে একটা প্রাইভেট কম্পানিতে।

বুঝতে পারলাম আমাদের পরিচয় জেনে ওনার জানার তৃষ্ণাটা কমালাম।

তারপর আরো কিছুক্ষণ কথা হলো।

যখন ট্রেন পৌছালো তখন সকাল সাতটা। হঠাৎই খেয়াল হলো, আবার শুরু হলো ব্যস্ত সময় কাটানো এই যান্ত্রিক শহরে।

মনে মনে ভাবলাম, এভাবে ঘুরে ঘুরে আজীবন কাটিয়ে দেয়া যায় না! সে আমার কোলে আর আমি জেগে জেগে দেখবো কোনো এক জার্নিতে।

ওকে বলেছি, আমি সব সফর তোমাকে এভাবেই চাই।

আমি চাই এ রকম স্বস্তিকর আর অস্বস্তিকর জার্নিতে শুধু সেই থাকবে আমার পাশে।

*ঠিকানা বিহীন*

noman123@gmail.com

# জাপানে

- মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী

২০০৪-এর নভেম্বর জাপানের নিপ্পন কেইদানরেন ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্ক এনভিরনমেন্ট প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য একমাত্র বাংলাদেশি নির্বাচিত প্রার্থী হিসেবে টোকিও যাই।

প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আমাদের অর্থাৎ ১৫টি দেশের ১৫জন অংশগ্রহণকারী জাপানের অন্যতম প্রাচীন শহর। কিয়োটো ভ্রমণে যাই। প্রাচীন শহর কিয়োটোর রয়েছে দুটি পরিচয়। এর একটি হচ্ছে এটা হাজার মন্দিরের শহর এবং অপরটি প্রাচীন রাজার রাজধানী। কিয়োটোবাসী এখনো মনে করে যে, জাপানের রাজধানী এক সময় টোকিও থেকে কিয়োটোতে ফিরে আসবে।

কর্তৃপক্ষ আমাদের কিয়োটো সফরের জন্য বুলেট ট্রেনের ব্যবস্থা করে যার নাম শিনকানসেন বুলেট ট্রেনলাইন। এর ভাড়া ছিল তেরো হাজার পাচশ বিশ ইয়েন। বাংলাদেশি টাকায় আট হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা। এর গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় দুইশ কিলোমিটার।

আমাদের সর্বমোট সময় লেগেছিল দুই ঘণ্টা একুশ মিনিট। ভ্রমণ এতোটাই আরামদায়ক ছিল যে, কোনোরূপ ক্লান্তি অনুভব করিনি। প্লেনের মতো সিট ছিল প্রতি বগিতে। ঝাকুনি কি জিনিস বুঝতে পারিনি। রেললাইন ছিল মাটি থেকে উপরে। টিকেট চেকার যেমনি ছিলেন দেখার মতো তেমনি ছিল তার ব্যবহার। এতোটা অমায়িক যা আমরা বাংলাদেশে কখনো কল্পনাও করতে পারি না। এক সময় আমরা টিকেট চেকারকে অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য। কিন্তু বিনীতভাবে জানালেন আধঘণ্টার মধ্যে তার কাজ শেষ হলে তিনি আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তিনি তার কথা রেখেছিলেন।

আমরা যে বুলেট ট্রেনে চড়েছিলাম সেটা ছিল সরকারি। বেসরকারি আরেকটি ট্রেন আছে যার গতি আড়াইশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এছাড়া আমরা টোকিও সিটিতে ব্যাপকভাবে সাবওয়ে ট্রেন ব্যবহার করেছি। প্রতিদিন আমরা আমাদের হোটেল গ্র্যান্ড প্যালেস-এর নিকটবর্তী কুডান সিটা থেকে টাকেবাসী যাতায়াত করতাম। এর ভাড়া ছিল একশ ষাট ইয়েন। টাকেবাসী স্টেশনের ওপরে ছিল থ্-স্টার হোটেল KKR।

একবার তো আমরা একুয়াসিটি ওদাইবা থেকে টোকিও ফেরার জন্য ঢাকার সোনারগাও হোটেলের মতো এক হোটেলের ভেতর থেকে ট্রেন ধরেছিলাম। সে এক মজার অভিজ্ঞতা।

সারা টোকিওতে কোনো পাবলিক বাস সার্ভিস নেই। জনপরিবহন হিসেবে সাবওয়ে ট্রেন ব্যবহৃত হয়। এটা যেমন আরামদায়ক তেমনি দ্রুতগামী।

আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমাদের থাই সাথী মিস নংয়ের সহায়তায় টোকিওতে ঘুরতে এবং শপিং করতে যেতাম। কারণ সে জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে পারতো।

টোকিওর অধিকাংশ সাবওয়ে স্টেশন ভূগর্ভে তিন তলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বেশ কিছু সাবওয়েতে শপিং মলও রয়েছে। এখানে জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলকভাবে শস্তা। প্রতিটি ট্রেনে গন্তব্যে পৌছার আগে ইংরেজি এবং জাপানিজ ভাষায় ধারাবর্ণনার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া দরজার ওপর চলমান মার্কিংও বিদ্যমান। সাবওয়ে ট্রেনগুলো এক মিনিট পর পরই স্টেশনে আসে এবং ছেড়ে যায়। যে জিনিসটি আমার ভালো লেগেছে সেটি হলো, স্টেশনের ভেতর অন্ধদের জন্য পথ নির্দেশনা। এছাড়া প্রতিটি বগিতে ছিল গর্ভবর্তী মহিলা, দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মহিলা এবং পঙ্গুদের জন্য আসন ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ সম্বলিত সিম্বল।

এখানে আরেকটি তথ্য না দিলেই নয়, টোকিও রেলওয়ে স্টেশন এতোটাই বড় যে, এখান থেকে বুলেট ট্রেন, কমপিউটার ট্রেন এবং সাবওয়ে ট্রেন ছাড়ে। এছাড়া এতে রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড, ডিপার্টমেন্ট স্টোর, দুটো আবাসিক হোটেল এবং আর্ট গ্যালারি।

আরেকটি ট্রেন ভ্রমণের কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সেটা হলো, গত ২০০২ সালের নভেম্বরে আমি, আমার স্ত্রী এবং দেড় বছরের কন্যা নাওয়ারসহ কলকাতার শিয়ালদহ থেকে দিল্লি গিয়েছিলাম *রাজধানী এক্সপ্রেস*-এ। থৃ টিয়ার্স-এর দুটো টিকেট কেটেছিলাম তিন হাজার একশ রুপিতে। এক হাজার পাচশ বিশ কিলোমিটার যেতে সাধারণত ষোল ঘণ্টা লাগলেও সেদিন আমাদের লেগেছিল আঠারো ঘণ্টা। যেটা বললেই নয় সেটা হচ্ছে খাবার। আমাদের টিকেটের দামের সঙ্গে খাবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

*দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা থেকে*
*yeasin@dhaka.net*

# শিমুল ফুলের মালা

**- মালতী**

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম তখন ট্রেনে করেই যেতে হয়েছিল। আমাদের এলাকা থেকে বাসে যাবার ব্যবস্থা থাকলেও ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে তারা ট্রেনে যাতায়াত করতে বেশি পছন্দ করে। কারণ ট্রেনে বড় পরিসরে কয়েকজন এক সঙ্গে বসে আড্ডা মারতে মারতে দূরের জার্নি করা যায়। শীত বা গরমের ছুটির পরে খুলনা, চুয়াডাঙ্গা বা আলমডাঙ্গার বন্ধুদের আগেই ইউনিভার্সিটিতে যাবার নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে রাখতাম। একই দিনে সবাই একই সঙ্গে দারুণ মজা করতে করতে যাওয়া হতো।

ইউনিভার্সিটিতে সাত বছরে পড়ার সুবাদে বহু ঘটনা ঘটেছে। কোনটা মজার, কোনটা বা কষ্টের। অনেক রাতে দূর থেকে যখন ট্রেনের হুইসল শুনি তখন কতো স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ি, *শাহ মখদুম এক্সপ্রেস*-এ বাড়ি ফিরছি। আমি আর আমার বান্ধবী দুজনেই এক সঙ্গে ফিরছি। আমার বাড়ি ফেরার তারিখটা আমার প্রিয় মানুষটাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম।

তখন ছিল বসন্তকাল। প্ল্যাটফর্মে নামার জন্য ট্রেনের হাতল ধরে দাড়িয়ে আছি, ট্রেন থামলে নেমে পড়বো। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার গলায় ইয়া বড় একটা শিমুল ফুলের মালা কে যেন পরিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি আমার প্রিয় মুখ এবং প্রিয় মানুষটা শিমুল ফুলের মালা হাতে চার পাচ জন বন্ধুদের সঙ্গে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন।

আমরা প্রেম করেছি একযুগ এবং আমাদের বিবাহিত জীবন ছয় বছরের। এতো বছরে সেদিনের সেই ট্রেন স্টেশনে শিমুল ফুলের মালা সে আমাকে পরিয়েছিল। আর কোনো মালা সে নিজ হাতে আমাকে পরায়নি। এটা একটা সুখের স্মৃতি।

*ঠিকানা বিহীন*

# লন্ডনি কন্যা

- খালেদুল হক আবীর

তারিখটা ছিল এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি। সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য মনস্থির করলাম। যতোটা না পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য তারচেয়ে বেশি উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে শাহজালাল, শাহ পরান ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখা। পরীক্ষার সময় ভিড় হবে জেনে পাচ সাত দিন আগেই ট্রেনের টিকেট কেটে নিই।

নির্দিষ্ট দিনের এক ঘণ্টা আগেই কমলাপুর স্টেশনে পৌছাই। স্টেশনে এদিকে-সেদিক কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে দুপুরের খাবারের জন্য একটি কেক ও কিছু চিপস, ডালভাজা কিনে আমার ট্রেনের নির্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসি। জানালা দিয়ে স্টেশনের বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকি। এমন সময় এক ভদ্রলোক একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক আমার সিটের পাশে বসে। মেয়েটি ছিল লম্বা, ফর্শা ও স্লিম। সব মিলিয়ে সুন্দরী। তার পরনে ছিল একেবারে সংক্ষিপ্ত পোশাক। পরনে জিন্স প্যান্ট ও গায়ে আটসাট গেঞ্জি।

বগির সবাই উৎসুক হয়ে মেয়েটিকে দেখছিল। আমিও আড়চোখে মাঝে মধ্যে তাকাতাম। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটি ওয়াকম্যান বের করে গান শুনতে লাগলো। ভাবলাম মেয়েটি হয়তো কোনো লন্ডনি কন্যা হবে।

এক সময় ট্রেন আখাউড়া স্টেশনে এসে পৌছাল। এখানে পচিশ ত্রিশ মিনিটের যাত্রাবিরতি আছে। এই ফাকে আমি ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে একটি বেঞ্চিতে বসে চা খেলাম।

এমন সময় দেখলাম মেয়েটি হেটে হেটে আমার দিকে আসছে।

এ সময় নিজেকে অনেকটা নার্ভাস ফিল করলাম। আমার সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বাংলাদেশি? বাংলাদেশে আপনার জন্ম?

তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, তিনি বাংলাদেশি, বাংলাদেশে তার জন্ম। খুব ছোট সময় ইংল্যান্ড চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই বড় হয়েছেন।

এতো সুন্দর করে বাংলা বলেন কিভাবে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, তাদের পুরো ফ্যামিলিই ইংল্যান্ডে থাকে। চাচা, মামা সবাই নিয়মিত বাংলাদেশে আসেন। আমরা যারা তাদের ছেলেমেয়ে তাদের নিয়মিত বাংলা শেখান। তাদের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এক কথায় তারা বাংলার প্রতি টান অনুভব করেন।

তার এ রকম সাবলীল কথাবার্তায় বিস্মিত হলাম। তার নাম কি? কি করেন? জিজ্ঞাসা করলে বলেন, তার নাম করবী চৌধুরী। পড়াশোনা করেন চাইল্ড সাইকোলজির ওপর। পড়াশোনা প্রায় শেষের পথে।

এরই মধ্যে ট্রেন ছাড়ার সময় হলে আমরা ট্রেনে গিয়ে বসলাম। তিনি এক সময় নিজ থেকে এ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, হরতাল ও অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন এবং নিজের মতামত তুলে ধরলেন। তার চাচাও মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণ করলেন। আমার এ ভেবে ভালো লাগলো যে, প্রবাসীরাও আমাদের দেশের বিষয়ে এতোটা চিন্তা করেন।

কথার ফাকে ফাকে তিনি তার ব্যাগ থেকে নানান রকম খাবার বের করে নিজে খেলেন, আমাকেও খেতে দিলেন।

আমার ব্যাগে শস্তা দামের খাবার থাকায় লজ্জায় তাকে সাধতে পারিনি।

রাত সোয়া দশটার সময় ট্রেন সিলেটে পৌছালো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় থাকবো?

কাছের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন আমার নেই। তাকে বললাম।

তাদেরকে নেয়ার জন্য আগে থেকেই স্টেশনে গাড়ি রেডি ছিল।

তিনি বললেন, এখান থেকে শহর একটু দূরে, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা তোমাকে হোটেলে পৌছে দিই।

তার কথায় রাজি হলাম। প্রথম হোটেলে গিয়ে দেখি কোনো সিট নেই। দ্বিতীয়টিরও একই অবস্থা। এভাবে সাত আটটি দেখার পরও কোনো রুম পেলাম না।

তিনি বললেন, পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুই এক দিন আগেই সব হোটেল বুক হয়ে যায়। তোমার দুই এক দিন আগেই আসা উচিত ছিল।

আমার মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো।

আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, তোমার অসুবিধা না হলে তুমি আজকের রাত আমাদের বাসায় থাকতে পারো। আমাদের বাসা এখান থেকে একটু দূরে।

কোনো উপায় না দেখে তার প্রস্তাবে রাজি হলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তাদের বাসায় পৌছালাম। বাড়ি দেখে হতবাক হলাম। বিশাল ও নিখুত আধুনিক কারুকাজ সমৃদ্ধ আধুনিক বাড়ি। বাড়িতে পাচ ছয়জন কাজের লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেলাম না।

তিনজনে এক সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম।

তিনি আমাকে দোতলার একটি রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাতে তুমি এখানেই থাকবে। সকালে একাই উঠতে পারবে, নাকি ডেকে দিতে হবে? জিজ্ঞাসা করে তিনি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি রাতের পোশাক পরে রুমে ঢুকলেন এবং একটি অ্যালার্ম ঘড়ি দিয়ে বললেন, সময় মতো এলার্ম দিয়ে রেখো।

তাদের কৃতজ্ঞতার কথা ভেবে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

হঠাৎ শেষ রাতের দিকে কারো রুমে ঢোকার শব্দ পেলাম। না বোঝার ভান করে শুয়ে থাকলাম। মনে মনে ভাবলাম কোনো ঘটনা ঘটবে না তো?

তিনি আমার পাশে এসে বসলেন।

নিজেকে অনেকটা নার্ভাস অনুভব করলাম।

এ সময় তিনি আমার চুলে কয়েকবার হাত বুলিয়ে গায়ের কম্বলটি মাথা পর্যন্ত টেনে দিলেন এবং রুমের এসি অন করে চলে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে আমার ভুল ভেঙে গেল। উঠে বসে তার উদারতার কথা ভাবতে লাগলাম।

সকালে অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙলো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গোসল সেরে বের হয়ে দেখি তিনি নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। নাশতার ভেতর তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন। আমার সঙ্গে পরীক্ষার হল পর্যন্ত যাবেন এবং পরীক্ষা শেষে তিনি আমাকে সিলেটের দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখাবেন।

পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগে আমরা হলে পৌছাই।

তিনি বললেন, সেখানেই অপেক্ষা করবেন।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হলে ঢুকলাম। মোটামুটি ভালোই পরীক্ষা দিয়ে বের হলাম। এরপর শুরু হলো দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার পালা। সিলেটের শাহজালাল, শাহ পরান মাজার দেখে একটি হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর এয়ারপোর্ট, পর্যটন কর্পরেশনসহ অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান দেখলাম। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। তাকে বললাম, আপনি এভাবে আর কষ্ট করবেন না। এবার আপনি বাসায় চলে যান। আমার গাড়ির আর মাত্র দুই তিন ঘণ্টা দেরি আছে। আমি এ সময়টুকু স্টেশনে ঘুরে কাটিয়ে দেবো।

তিনি বললেন, মাঝে মধ্যে দেশে আসলেও এভাবে ঘরে দেখা হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, এভাবে ঘুরে আমার ভালো লেগেছে।

তিনি আমার বাসার ঠিকানা নিলেন। তার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিলেন এবং বললেন, আমাকে তার অনেক দিন মনে থাকবে।

বললাম, আপনাকেও আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

বিদায়কালে তিনি আমার কপালে একটা হালকা চুমু দিয়ে বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার গাড়ি ছাড়ার সময় হলো। গাড়িতে বসে বার বার তার কথা, তার দেশপ্রেমের কথা, নিঃস্বার্থ উপকারের কথা, অতিথেয়তার কথা ও আমার মতো একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানকে আপন করে নেয়ার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*